যদি বলেন, কেহ স্বাভাবিক উৎসাহে তদপেক্ষা অধিক দান করিলে তাহা গ্রহণে ক্ষতি কি? মনে করুন, যেই উত্তেজনায় সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য থাকে না তাহা উৎসাহ নহে, পাগলামি, ইহার সংশোধন ওয়াজেব। এস্থলে হাদিয়া, ছদ্‌কা ইত্যাদি আর্থিক এবাদত সম্পর্কিত আরও একটি বিষয় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা এই যে, হাদিয়া, ছদ্‌কা, চাঁদা, করযে হাসানা প্রভৃতি যাহাকিছু লেনদেনের নিয়ম রহিয়াছে, কোনটিই হারাম মালের দ্বারা না হওয়া চাই। কেহ হারাম মাল হইতে দান করিতে চাহিলে পরিষ্কার নিষেধ করিয়া দিতে হইবে। যাহাকিছু বর্ণনা করিলাম, তাহা হাদিয়া সংক্রান্ত কথা ছিল।

চাঁদা আদায় করার শর্তসমূহঃ যে সমস্ত বিষয়ে অসাবধানতা অবলম্বন করা হয় তন্মধ্যে আর একটি বিষয় চাঁদা। ইহাতে প্রথম কর্তব্য—কাহারও নিকট হইতে সাধ্যের অতিরিক্ত চাঁদা গ্রহণ না করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন ব্যক্তি হইতে তাহার সাধ্যের অধিক দান গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য যাঁহাদের তাওয়াক্কুলের শক্তি সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁহাদের সাধ্যের অতিরিক্ত দানও গ্রহণ করিতেন; যেমন, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দান। হুযূর (দঃ) তাঁহার সম্পূর্ণ পুঁজিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর একটি শর্ত এই যে, চাঁদাদাতার মনে কষ্ট বা অসন্তোষ আসে এমন পন্থায় তাহা হইতে চাঁদা আদায় করিবে না। কেননা, হাদীসে আসিয়াছে— لَايَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِهٖ “কোন ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে দান না করিলে তাহার দান গ্রহণ করা হালাল নহে।”

আর একটি শর্ত এই যে, চাঁদা গ্রহণকারী যেন লোকচক্ষে হীন বা হেয় না হয়। কেননা, চাঁদা গ্রহণের কোন কোন পন্থা এমনও আছে যে, তাহাতে দাতার পক্ষে অবশ্য কষ্টকর হয় না, কিন্তু লোকের দৃষ্টিতে গ্রহণকারী হেয় হইয়া যায়। হাদীস শরীফে এই কারণেই সওয়াল করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং যেখানে দাতার পক্ষেও কষ্টকর না হয় এবং গ্রহণকারীকেও লোকচক্ষে হেয় হইতে না হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনের সময় চাঁদা চাওয়া জায়েয। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ “চাহিবার প্রয়োজন হইলে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের নিকট চাও।” আমরা যাহারা আল্লাহ্‌ওয়ালা হওয়ার দাবীদার, এই হাদীসটি শ্রবণ করিয়া খুবই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িব। খোদা মঙ্গল করুন, এখন প্রার্থীরা আসিয়া ভিড় করিবে। হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, “অথবা রাজা-বাদ্‌শাহ্‌দের নিকট চাহিও।”

সারকথা এই যে, “আল্লাহ্‌ওয়ালাদের নিকট চাহিও কিংবা খুব বড় ধনবান লোকের নিকট চাহিও।” ইহার রহস্য এই যে, সওয়াল করা হারাম হওয়ার দুইটি কারণ। একটি প্রার্থীর হীন হওয়া, দ্বিতীয়টি প্রার্থিত ব্যক্তির পক্ষে কষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা। এই দুইটি কারণ একত্রে সমাবিষ্ট হইলে সওয়াল করা তো হারাম হইবেই; ইহাদের যেকোন একটি কারণ পাওয়া গেলেও তথায় সওয়াল করা নিষিদ্ধ। বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহার পক্ষে দান করা কষ্টকর হইবে না। কেননা, যাঁহার নিকট কোটি কোটি টাকা রহিয়াছে, দশ-পাঁচ টাকা দান করা তাঁহার পক্ষে কিসের কষ্ট? প্রার্থীকেও হীন হইতে হইবে না। কেননা, বাদশাহ্‌র মর্যাদা এত অধিক যে, প্রার্থী তাঁহার দৃষ্টিতে সম্মানিতই কখন ছিল, যাহাতে আজ প্রার্থনার ফলে হীন হইয়া যাইবে? আর আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশও এই জন্যই হইয়াছে যে, বুযুর্গ লোকেরা নিজদিগকে সর্বাপেক্ষা ছোট মনে করিয়া থাকেন, কাজেই কেহ তাহাদের নিকট কিছু চাহিলে প্রার্থী তাঁহাদের দৃষ্টিতে হীন হওয়ার আশঙ্কা নাই। আবার তাঁহাদের অন্তরে দয়া অধিক। সকলের প্রতি তাঁহাদের

দয়া অবারিত। কাজেই তাঁহারা কাহাকেও হীন মনে করিবেন কেন? আর দান করা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর এই জন্য নহে যে, তাঁহারা সকল ব্যাপারেই স্বাধীন। না দিতে হইলে স্বাধীনভাবেই নিষেধ করিয়া দিবেন। কাহারও নিকট তাঁহারা দমিবেন কেন? কাজেই মনঃকষ্ট তাঁহাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। তাঁহাদের সরলতা ও স্বাধীনতার অবস্থা নিম্নোক্ত বয়েতগুলি হইতে বুঝিতে পারিবেন ঃ

دل فریباں نباتی همه زیور بستند   دل برماست که با حسن خدا داد او آمد
زیر بارند درختاں که ثمرها دارند   اے خوشا سرو که از بند غم آزاد آمد

“সমস্ত উদ্ভিদ ফল ও ফুলের অলঙ্কারে সুসজ্জিত। কিন্তু আমার প্রিয়জন খোদাদত্ত সৌন্দর্যের অধিকারী। তাঁহার অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই। সমস্ত বৃক্ষরাজি ফলের ভারে অবনত। কিন্তু ‘বেদ’ বৃক্ষ এই চিন্তার বেড়ি হইতে মুক্ত।” আর এক কবি তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

گر دوصد زنجیر آری بگسلم ـ غیر زلف آں نگارے دلبرم

“আমার মা’শুকের চুলের রশি ব্যতীত যদি দুই শত শিকলও আন, আমি সহজেই ছিঁড়িয়া ফেলিব।” অর্থাৎ, খোদার নির্দেশ বা বিধানের বেড়ি ব্যতীত অপর কোন বেড়িই তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে না। দুনিয়াতে মান-সম্মানের বেড়িই কঠিন শৃঙ্খল। তাহা তো তাঁহারা নির্মূলই করিয়া দিয়াছেন। ইহার পন্থা নিম্নোক্ত বয়েত হইতে বুঝিয়া লউন ঃ

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما   اے طبیب جمله علتهائے ما
اے دوائے نخوت وناموس ما   اے تو افلاطون جالینوس ما

“হে আমার শুভ লক্ষণ প্রেম! তুমিই আমার সর্ববিধ রোগের চিকিৎসক, তুমি গর্ব-অহঙ্কারের ঔষধ, তুমিই আমার আফ্‌লাতুন, তুমিই আমার জালীনূস্‌।” আর এক করি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

هرکرا جامه ز عشق چاك شد ـ او ز حرص وعیب کلی پاك شد

“এশ্‌কের উন্মাদনা যাহার পোশাক ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে, সে লালসা ও কামনারূপ দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছে।” ইহাতে তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ হয় ঃ

ساقیا برخیز در ده جام را   خاك بر سر کن غم ایام را
گرچه بد نامی ست نزد عاقلاں   ما نمی خواهیم ننگ ونام را

“সাকী! যমানার চিন্তার মাথায় ধূলি নিক্ষেপ কর। উঠ এবং আমাকে শরাব ও পেয়ালা দান কর। জ্ঞানীদের নিকট যদিও ইহা দুর্নামের কারণ; কিন্তু আমি সুনাম ও সম্মান চাই না।”

মোটকথা, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহাদের উপর কোন কিছুর প্রভাব পড়িতে পারে না। এই কারণেই কেবল আল্লাহ্‌ওয়ালা এবং বাদ্‌শাহদের নিকট সওয়াল করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যখন সওয়াল নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ জানা গিয়াছে, তখন যদি ইঁহাদের মধ্যেও কোন সময় উক্ত কারণ পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদের নিকট সওয়াল করাও জায়েয নহে। আর এই কারণেই আমিও চাঁদা আদান-প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। অন্যথায় সকল অবস্থায় নিষেধ করা

উদ্দেশ্য ছিল না। ইহাও বুঝিয়া লউন, ধর্ম সকল সময়ই মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে আলেমের সম্মানে ধর্মের সম্মান বুঝা যায়। যদি আলেমগণ সাধারণের দৃষ্টিতে হেয় হইয়া পড়েন, তবে মনে করিবেন যে, ধর্মও লোকের নিকট হেয় হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে ধর্ম যে লোকের নজরে হেয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহার কারণ শুধু আমরাই এবং অভাবগ্রস্তের আকারে আমাদের সমাজের মুখাপেক্ষী হওয়া। যদি মানুষ আমাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং ধর্মীয় শিক্ষাকে হীনতার কারণ বলিয়া মনে করে, তবে আমরাই এই হীন মনে করার কারণ হইলাম। পক্ষান্তরে এই মুখাপেক্ষিতা আমাদিগকেও এমন অবস্থায় পৌঁছাইয়াছেঃ

آنکـــه شیـــراں را کنـــد روبـــه مزاج   احتیاج است احتیاج است احتیاج

“অভাব ব্যাঘ্রকে শৃগালে পরিণত করে।” কিন্তু কেহ কেহ এমন সাহসীও আছেন যে, অভাব সত্ত্বেও কাহারও নিকট ছোট হওয়া পছন্দ করেন না। ইরানের এক শাহযাদা কোন কারণে ভবঘুরে হইয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় জনৈক আমীর লোক মুসাফিররূপে বাস করিতেছিলেন। শাহ্‌যাদা তাঁহাকে দাওয়াত করিলেন। অপর এক সময়ে শাহ্‌যাদা সফরের অবস্থায় অস্থির হইয়া ঘটনাক্রমে সেই আমীরের গৃহে যাইয়া পৌঁছিলেন। তিনি একটি জীর্ণ-শীর্ণ টাট্টু ঘোড়ার উপর আরূঢ় ছিলেন। আমীর লোকটি এই অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতির সুরে বলিলেনঃ

آنکهٔ شیراں راکند روبه مزاج ـ احتیاج است احتیاج است احتیاج

শাহ্‌যাদা ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেনঃ

شیر نرکے می شود روبه مزاج ـ میزند برکفش خود صد احتیاج

“পুরুষ সিংহ শৃগাল স্বভাব কেমন করিয়া হইতে পারে? শত অভাব হইলেও সে তাহা পাদুকার উপর ছুড়িয়া মারে।” আরও বলিলেনঃ তুমি আমাকে দারিদ্র্যের কারণে হীন মনে করিতেছ? এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

যাহারা সমাজে বরেণ্য বলিয়া পরিচিত, তাহাদের একান্ত প্রয়োজন সাধারণের দৃষ্টিতে হেয় না হওয়া। অভাবশূন্যতা হইতে ইহা লাভ হয়। অবশ্য চাঁদার প্রয়োজন হইলে সর্বসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করায় ক্ষতি নাই। ব্যক্তিগতভাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট যাচ্ঞা করাতে যদি মনে বিশ্বাস হয় যে, আমিও হেয় হইব না এবং যাচ্যমানের পক্ষেও কষ্টকর হইবে না, তখন জায়েয হইবে। আর যদি ইহার কোন একটিরও সম্ভাবনা থাকে, তবে জায়েয হইবে না। আর আমি যে চাঁদা আদায়ে নিষেধ করিয়া থাকি, তাহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট চাঁদা চাহিয়া নিজে হেয় হওয়া কিংবা তাহার মনে কষ্ট দেওয়ার অবস্থায়। এ সম্বন্ধে আমার যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ইহা তাহারই বিশ্লেষণ।

তবে আমল করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, চাঁদার জন্য সর্বসাধারণের নিকট ব্যাপক আবেদনে বাধা দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাহারও নিকট উপরোক্ত দুই অবস্থায় চাঁদা চাওয়া পরিত্যাগ করা উচিত। এখন আমি সর্বসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। ইহা সওয়ালও নহে; বরং ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করা।

শরীঅতানুগ চাঁদার প্রতি উৎসাহ প্রদানঃ এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে যথেষ্ট মীমাংসা রহিয়াছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ

"যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিকট মাল চান এবং পীড়াপীড়ি করিয়া চান, তবে তোমরা কার্পণ্য করিতে আরম্ভ করিবে। আর তিনি তোমাদের বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।" সম্মুখের দিকে আরও বলিতেছেনঃ

هَاَنْتُمْ هٰۤؤُلَاۤءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ج فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا
يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط وَاللهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ
لَايَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ○

দেখুন, একদিকে সওয়াল করিতে নিষেধ করিতেছেন। অপর দিকে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার এবং ব্যাপকভাবে তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদানকে অনুমোদন করিতেছেন। আবার সওয়াল করার পর কার্পণ্য করিলে তাহার বিশেষ নিন্দাবাদও করিতেছেন না; বরং তাহাতে এক প্রকার মা'যুর বা অক্ষম মনে করা হইতেছে। যেমন فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا বাক্যে গভীর চিন্তা করিলে বুঝা যায়। আবার দান করার প্রতি আহ্বান করিলে কার্পণ্য প্রকাশের নিন্দা করিয়া বলিতেছেনঃ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন পরোয়া নাই। কেননা, اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা দান করিতে অস্বীকৃত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের স্থানে অপর জাতি সৃষ্টি করিবেন। তাহারা তোমাদের ন্যায় কৃপণ এবং পশ্চাদপসরণকারী হইবে না। সকল বিষয়ে তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হইবে। দেখুন, উৎসাহ প্রদান করিয়া আবার কৃপণতার জন্য কেমন ধমক প্রদান করিলেন, কেবল তোমাদের টানেই গাড়ী চলে না। আরও সহস্র সহস্র খেদমতগার বিদ্যমান আছেঃ

منت منه که خدمت سلطان همی کنی ـ منت شناس ازو که بخدمت بداشتت

"বাদশাহের সেবা করিতেছ বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছ; বরং তিনি যে তোমাকে খেদমতের সুযোগ দিয়াছেন ইহাকেই তোমার প্রতি অনুগ্রহ মনে কর যে, আমার দ্বারা এমন মহৎ কাজ করাইয়া লইয়াছেন।" অতএব, খোদারই অনুগ্রহ আমাদের প্রতি রহিয়াছে। ফলকথা, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, সওয়াল করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। অর্থাৎ, যাহাতে যাচ্যমান ব্যক্তির উপর চাপ দেওয়া হয়। চাপ দেওয়া দুই প্রকার। বাহ্যিক চাপ প্রয়োগ আর অজ্ঞাতসারে বা প্রকারান্তরে চাপ প্রদান। যেমন, মর্যাদার প্রভাবে আদায় করা। ইহাও চাপ প্রয়োগেরই প্রকারবিশেষ। মোটকথা, যাহাতে যাচ্যমান ব্যক্তির মনে ব্যথা দেওয়া হয় তাহাই চাপ প্রদান করা। এমতাবস্থায় কার্পণ্য করা বিচিত্র নহে। আর এক প্রকার চাঁদা আদায় করা হয় উৎসাহ প্রদান করিয়া। তদবস্থায় যাচ্যমান ব্যক্তি কার্পণ্য করিলে তাহা নিন্দনীয়। আমি মনে করি, শরীঅত বিগর্হিত যত উপায়ে চাঁদা আদায় করা হয়—তাহা সওয়ালের অন্তর্গত। আর শরীঅতসম্মত উপায়ে যাহা আদায় করা হয়, তাহা তরগীব (উৎসাহ)-এর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মানুরাগের দৃষ্টান্তঃ সারকথা, আমি আপনাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছি; কিন্তু এই উৎসাহ প্রদান সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু এ মুহূর্তে খুব একটা আমার স্মরণ নাই। হাঁ, কেবল এই আয়াতটি মনে পড়িয়াছেঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

"যাহারা নিজেদের মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্য-বীজের ন্যায়, যাহা হইতে সাতটি ছড়া উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক ছড়ায় একশতটি বীজ থাকে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন—ইহার অধিক দান করেন। আল্লাহ্‌র দান খুব প্রশস্ত এবং তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।" এস্থলে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার রাস্তায় ব্যয় করার হুকুমই বর্ণনা করিয়াছেন। এই তৃতীয় পারার এক-চতুর্থাংশ দানেরই ফযীলত সম্বন্ধীয় বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহাতে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা অতি বড় প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু আফ্‌সোস! আমাদের অবস্থা এইরূপঃ

گر جاں طلبی مضائقه نیست ۔ گر زر طلبی سخن دریں ست

"প্রাণ চাও ক্ষতি নাই, যদি টাকা-পয়সা চাও তাহাতে কথা আছে।" আমাদের মনে ধর্মের প্রতি যে অনুরাগ আছে—ইহার সারমর্ম তাহাই যাহা মাওলানা রূমী (রঃ) মস্‌নবীতে বলিয়াছেন। এক মুসাফির ব্যক্তি পথ চলাকালে দেখিতে পাইল, একটি কুকুর মুমূর্ষু অবস্থায় শ্বাস টানিতেছে এবং একটি লোক উহার নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছে। মুসাফির তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিলঃ "এই কুকুরটি আমার অতিশয় প্রিয় বন্ধু ছিল। আজ সে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। আমি সেই দুঃখে ক্রন্দন করিতেছি।" পথিক জিজ্ঞাসা করিলঃ "ইহার রোগ কি?" বলিলঃ "শুধু ক্ষুধার জ্বালা।" এই ঘটনা শুনিয়া মুসাফিরের সেই লোকটির এবং কুকুরটির অবস্থার প্রতি দয়া হইল। নিকটেই একটি ভর্তি থলিয়া দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ "ইহাতে কি?" সে বলিলঃ "রুটি ভর্তি রহিয়াছে।" পথিক বলিলঃ "যালেম! কুকুরের মৃত্যুর জন্য কাঁদিতেছ; অথচ এতটুকু করিতে পার না যে, থলিয়া হইতে একটি রুটি বাহির করিয়া উহাকে খাইতে দাও।" সে বলিতে লাগিলঃ "জনাব! উহার সহিত আমার এই পরিমাণ বন্ধুত্ব নহে যে, তাহার জন্য রুটিও খরচ করিতে আরম্ভ করিব। রুটির মূল্য দিতে হইয়াছে, কিন্তু অশ্রুবিন্দু বিনা পয়সার!"

অনুরূপ আরও একটি কাহিনী আছে। এক ব্যক্তির পুত্র পীড়িত হইল, কেহ কোরআন শরীফ খতম করাইবার পরামর্শ দিল। অপর এক ব্যক্তি কিছু দান-খয়রাত করার পরামর্শ দিল। সে কোরআন শরীফ পড়াইল, কিন্তু খয়রাতের এক পয়সাও দিল না। এইরূপে আমরা মহব্বতের দাবী অবশ্য করিয়া থাকি, কিন্তু পয়সা ব্যয় করার প্রয়োজন হইলে মহব্বত উঠিয়া যায়।

আর আমি যে এখন আপনাদিগকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ দিতেছি, ইহার অর্থ এই নহে যে, আপনাদিগকে দান করিতেই হইবে। কেননা, ধর্মের কাজ ইনশাআল্লাহ্ আপনারা না দিলেও অবশ্যই চলিয়া যাইবে। আপনাদের তাহা জানা আবশ্যক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দানের ক্ষেত্রও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু তাহা বলার পূর্বে প্রকাশ করিয়া দিতেছি যে, আমি যাহাকিছু বলিলাম, কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বলি নাই। সম্মুখেও যাহা বলিব, কাহারও অনুরোধে বলিব না। হাঁ, আমি জানি না,

কোন কামেল লোক আধ্যাত্মিক প্রভাবে আমার অন্তরে এই দান-খয়রাতের কথা জাগাইয়া দিয়াছেন কিনা। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত একথাও অস্বীকার করিতেছি। কেননা, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্! আমাদের বুযুর্গানের মধ্যে এরূপ কেহ নাই যিনি এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রয়োগে কাজ উদ্ধার করিবেন। বিশেষত যেখানে তাঁহাদের মরজীর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, খোদা তা'আলা মনে জাগাইয়া দিয়াছেন এবং আমি বর্ণনা করিয়াছি।

যাহাহউক, দান-খয়রাতের ক্ষেত্র সম্বন্ধে মীমাংসা এই যে, সমাজের হিতকর সমিতি, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি সবগুলিই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন যাহার প্রয়োজন অধিক দেখা যায়, সেদিকেই অধিক লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমার বিবেচনায় বর্তমানে মাযাহারে উলূম মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। পরিমাণেও, রকমেও; বরং সকলে উহার প্রয়োজন স্বচক্ষে দর্শন করুন। সকলে দর্শন করিলেই ইন্‌শাআল্লাহ্ বরকত হইবে।

ছাত্রাবাসের ফযীলত ঃ দ্বীনী এল্‌ম অন্বেষণকারীদের ছাত্রাবাস সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ اَوْبَيْتًا لِّاَبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ 'মুসাফিরের জন্য কোন ঘর নির্মাণ করা' যদিও সেই মুসাফির গুনাহ্‌গার ফাসেক হয়, তবুও অবশ্য নির্মাণকারীর সওয়াব হইবে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যেই মুসাফির দ্বীনী এল্‌মের তালেব (অন্বেষণকারী), যাঁহারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মেহ্‌মান, তাঁহাদের জন্য ঘর নির্মাণ করিলে কি পরিমাণ সওয়াব হইবে? আবার এমনও নহে যে, তাহারা উক্ত গৃহে নীরবে শুইয়া-বসিয়া থাকিবেন; বরং সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র কালাম এবং রাসূলের হাদীস শরীফ পাঠ করিতে থাকিবেন। যাহার সমতুল্য দুনিয়াতে কোন কাজই নাই। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنٌ وَّمَا فِيْهَا مَلْعُوْنٌ اِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ ○

"দুনিয়া এবং ইহার মধ্যস্থিত সবকিছুই অভিশপ্ত—আল্লাহ্‌র যেকের এবং ইহার দোস্তদার কিংবা আলেম এবং তালেবে এলম ব্যতীত।"

দ্বীনী এল্‌ম আল্লাহ্‌র যেকেরও বটে; ইহাতে আলেম, তালেবে-এল্‌মও এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম ও যেকেরের দোস্তদারগণও একত্রিত রহিয়াছেন।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র যেকের, উহার দোস্তদারগণ, আলেম এবং তালেবে-এলমগণ লা'নত হইতে বাদ রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার আর সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হইতে দূরে পতিত হওয়ার কারণ। ইহাতে কোন কোন খাঁটি বান্দা নিজের দুনিয়াবী সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে চিন্তিত হইতে পারিতেন; কিন্তু হুযূর (দঃ) ইহার কেমন সুন্দর সমাধান করিয়া দিয়াছেন! যেন একটি পবিত্র স্পর্শমণি। অর্থাৎ, মানুষ যদি দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জামকে খোদার যেকের, দ্বীনী এলমের সাহায্য ও ভালবাসার কাজে লাগাইয়া দেয়, তবে সবকিছুই নৈকট্যের কারণ হইয়া যাইবে এবং এবাদতে গণ্য হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক স্পর্শমণি আর কি হইবে? লা'নত এবং দূরত্বের কারণকে নৈকট্য ও এবাদতের উপকরণে পরিণত করিয়া দিলেন, তাহাও আবার সামান্য একটু আঁচ দ্বারা। মাওলানা এই বিষয়টিই বলিতেছেন ঃ

عین آں تخییل را حکمت کند ـ عین آں زهر آب را شربت کند

"মহব্বত কল্পনাকে জ্ঞানে এবং বিষাক্ত পানীয়কে শরবতে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।"

آں گماں انگیز را سازد یقین ـ مهرها رویاند از اسباب کین

"ইহার বদৌলত ধারণা বিশ্বাসের অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শত্রুতা মিত্রতায় পরিবর্তিত হয়।"

ছদ্‌কায়ে জারিয়ার ফযীলত্‌ঃ এই ভাবিয়া মানুষের গর্বিত হওয়া উচিত নহে যে, আমরা তো এই সমস্ত কার্যে দান করিয়া থাকি। এইমাত্র মাদ্রাসায় দান করিলাম। অতএব, আমরা সর্বপ্রথম দাতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি। তাঁহারা যাহাকিছু দান করিয়াছেন, আমার উৎসাহ প্রদানে দান করেন নাই। উৎসাহ প্রদানে দান করিয়াছেন বলিয়া তখনই বুঝা যাইবে, যাঁহারা মাদ্রাসায় ইতিপূর্বে কিছু দান করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই পরিমাণ এখন দারুত তোলাবায়ও দান করেন। যাঁহারা এখন পর্যন্ত কিছু দান করেন নাই, তাঁহারাও যখন ইচ্ছা হয় দান করেন। আর যাঁহারা সঙ্গে কিছু আনেন নাই, তাঁহারা ওয়াদা করেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ওয়াদা যেন শুধু মৌখিক না হয়; বরং পূর্ণও করেন। কেহ বেশী বা কমের চিন্তা করিবেন না। ইহা ছদকায়ে জারিয়া। যাহাকিছু সাধ্য হয়, শরীক হওয়াকে গনীমত মনে করিবেন। ছদ্‌কায়ে জারিয়া এই যে, মানুষ মৃত্যুর পরে যখন সামান্য একটু নেকীর জন্য অস্থির থাকে এবং চিন্তা করিতে থাকে; আহা! যদি এখন কেহ অন্তত "সোব্‌হানাল্লাহ্‌" পড়িয়া ইহার সওয়াব আমাকে দান করিত। বড় বড় ওলীআল্লাহ্‌গণও এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন ওলী পরলোকে বলেনঃ

اے کہ بر ما می روی دامن کشاں ۔ از سر اخلاص الحمد ے بخواں

"ওহে! যাহারা আমার কবরের নিকট দিয়া সানন্দে চলিয়া যাইতেছ, খাঁটি মনে অন্তত একবার 'আল্‌হাম্‌দু' পড়িয়া যাও।" অর্থাৎ, আর কিছু না হইলেও অন্তত একবার 'আল্‌হামদু' পড়িয়া সওয়াব বখশাইয়া যাও। আজ যেই 'আল্‌হামদু' আমরা সহস্রবার নিজে পড়িতে পারিতেছি, মৃত্যুর পরে তাহা পরের মুখে অন্তত একবার পড়িবার জন্য ব্যস্ত থাকিব। এই ছদ্‌কায়ে জারিয়া তখন কাজে আসিবে, যখন কিয়ামতের দিন আমল সম্মুখে ধরা হইবে এবং দেখিবে যে, আমার নিকট কোন নেকী নাই, তখন পাতা উল্টাইলে দেখিতে পাইবে—কোন স্থানে বোখারী শরীফের সওয়াব লিখিত রহিয়াছে, কোন স্থানে মুসলিম শরীফের সওয়াব লিখিত রহিয়াছে, কোথাও বা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব লেখা দেখা যাইতেছে ইত্যাদি।

বন্ধুগণ! আজ হইতে সহস্র বৎসর পরে কিয়ামত আসিলে তখন পর্যন্ত এখানে কিংবা এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওলামাদের মধ্যে যতবার বোখারী শরীফ খতম হইবে এবং যতবার মুসলিম শরীফ পড়ান হইবে, ততবারই দাতার রূহের উপর সওয়াব পৌঁছিতে থাকিবে এবং কিয়ামতে তাহার চরম অস্থিরতার সময়ে ইনশাআল্লাহ্‌ বলা হইবেঃ

جمادت چند دادم جاں خریدم ۔ بحمد اللہ زہی ارزاں خریدم

তুমি দারুত্‌ তোলাবায় সাহায্য করিয়াছিলে, আজ উহারই বদৌলত তুমি এই রাশি রাশি সওয়াব লাভ করিতেছ। তখন আনন্দিত হইয়া অবস্থার ভাষায় বলিতে থাকিবেঃ

"ইট-পাথরের কয়েকটি খণ্ডের বিনিময়ে আমি প্রিয়জনের সন্তুষ্টি খরিদ করিয়াছি। সোব্‌হানাল্লাহ্‌! কেমন সস্তার সওদা খরিদ করিয়াছি!"

আর তখন বুঝিতে পারিবে, এক টাকা কিংবা দুই টাকা দান করার ফলে কত বড় মুনাফা করিয়াছ। বন্ধুগণ! খোদা তা'আলার শোকর করা উচিত যে, এত বড় সম্পদ বিনামূল্যে হস্তগত হইতেছে। সম্ভবত কোন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক সন্দেহ করিতে পারেন, যখন এই স্থানে এই তা'লীমের কাজ কিংবা স্বয়ং এই স্থান থাকিবে না, তখন সওয়াব কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? প্রথমত, এমন ধারণা করাই অন্যায়। দ্বিতীয়ত, মনে রাখিবেন, নেক কাজের ধারা কখনও বন্ধ হয় না।

اگر گیتی سراسر باد گیرد ـ چراغ مقبلاں ہرگز نمیرد

“সমস্ত ভূমণ্ডল পুরাপুরি বায়ুতে পরিণত হইলেও আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের চেরাগ নিভে না।”

মোটকথা, নেক কাজের ধারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। যদি মনে করা হয় যে, বন্ধ হইয়াই গেল, তবে এই নীতি নির্ধারিত রহিয়াছে যে, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ “কার্যের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হইয়া থাকে।” দাতাগণ সর্বদার জন্য ইহার সাহায্যকল্পেই দান করিয়া থাকেন। যদি ইহাই হয়, যতদিন পর্যন্ত এখানে শিক্ষাকার্য চলিয়াছে ততদিনই সওয়াব পাওয়া যাইবে। তবে অনন্ত বেহেশ্‌তের সুখ ভোগের অধিকার কেমন করিয়া থাকিবে? কেননা, পূর্ণ একশত বৎসরই যখন নেক কাজ করা হয় নাই, তখন একশত বৎসরের অধিককাল বেহেশ্‌তে কেমন করিয়া থাকিবে? অথচ বেহেশ্‌তীরা বেহেশ্‌তে অনন্তকাল অবস্থান করিবে বলিয়া প্রমাণিত রহিয়াছে। বস্তুত শুধু নিয়তের কারণেই অনন্তকাল অবস্থানের অধিকার পাওয়া যায়। কেননা, প্রত্যেক মুসলমানেরই নিয়ত এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিলে এই ধর্মের উপরই স্থায়ী থাকিবে। এই কারণেই অনন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এস্থলেও নিয়তের বদৌলতই কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পাওয়া যাইবে। অতএব, এরূপ সন্দেহ অমূলক। সারকথা এই যে, ধর্ম-কর্মের মধ্যে দৈহিক এবাদত এবং আর্থিক এবাদতে পার্থক্য করা ভুল। কেননা, আল্লাহ্ পাক বলেনঃ “আল্লাহ্ তোমাদের জান এবং মালকে খরিদ করিয়াছেন বেহেশ্‌তের বিনিময়ে।” কাজেই শুধু অর্থ দানকারীদেরও গর্বিত হওয়া উচিত নহে এবং শুধু পরিশ্রম সহকারে দৈহিক এবাদতকারীদেরও গর্বিত হওয়াও অনুচিত; বরং উভয়বিধ এবাদত একত্রিত হইলে বেহেশ্‌তে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যাইবে। অতএব, বন্ধুগণ! বেহেশ্‌ত এত সস্তা নহে। খুব অনুধাবন করুন। اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللهِ هِىَ الْجَنَّةُ “মনে রাখিবেন, আল্লাহ্‌র পণ্যদ্রব্য খুবই দুর্মূল্য। মনে রাখিবেন, আল্লাহ্‌র পণ্যদ্রব্য হইল বেহেশ্‌ত।”

এখন আমি তালেবে এল্‌ম্‌দের উদ্দেশে একটি কথা বলিতেছি—এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, জান্ খাটাইয়া পরিশ্রম করা তো নির্দিষ্ট কতিপয় কার্যে হইয়া থাকে। যেমন, যুদ্ধ করা। আলোচ্য আয়াতে সম্মুখের দিকে উল্লেখও রহিয়াছে يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ তবে পরিশ্রম সকল এবাদতে ব্যাপক কেমন করিয়া হইল?

ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা আরও একটু সম্মুখের দিকে বলিয়াছেনঃ اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الخ ○ এই আয়াতে উপরোক্ত সন্দেহের অপনোদনপূর্বক বলিতেছেন—এই সমুদয় কার্য নফ্‌সের শ্রমমূলক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, সম্মুখের দিকে আরও বলিতেছেনঃ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط এই اَلْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতের প্রথম ভাগের مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -এরই পুনরুক্তি। অতএব, এই কার্যগুলি উল্লেখের পর হুযূর (দঃ)-কে এই নির্দেশ দেওয়া “আপনি উপরোক্ত মুমেনদিগকে খোশখবরী দিন।”—প্রকাশ্যভাবেই বুঝাইতেছে যে, যেই জানমাল খরিদের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এসমস্ত কার্যেই বটে; সুতরাং এসমস্ত কার্যই নফ্‌সের শ্রমমূলক কাজ। এই বর্ণনা হইতে আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সমগ্র শরীঅত শুধু দৈহিক এবং আর্থিক এবাদতের বিস্তারিত বিবরণ। অদ্য এই বিষয়টি বর্ণনা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দান করুন।

اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

সাহারানপুর জামে মসজিদ
২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৩৩০ হিজরী

— ■ —

তায্‌কীরুল্ আখেরাহ্

[পরকালের আলোচনা]

◆

"কোরআন মজীদকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ মনে করা, ইহাতে বিজ্ঞান এবং দর্শনের বিধানাবলী তালাশ করা, গ্রহ-নক্ষত্রাদির তথ্য অনুসন্ধান করা অবিকল সেইরূপ—যেমন 'তিব্বে আকবর' নামক চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থে জুতা সেলাইয়ের প্রণালী খুঁজিয়া দেখা।" —"কোরআন মজীদে তো কেবল আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং নফসের সংশোধন ব্যবস্থাই পাওয়া যাইবে, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সহিত ইহার কি সম্পর্ক?"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ط

উপক্রমণিকা

আমি এখন যে বিষয়টি বর্ণনা করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। মৌলবী শাব্বীর আহ্‌মদ ছাহেব পরকাল সম্বন্ধে যে ওয়ায করিয়াছেন—আমার অদ্যকার ওয়ায হইবে উহার পরিশিষ্টস্বরূপ। মৌলবী ছাহেব নিজের ওয়াযে আখেরাত সম্বন্ধীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি আখেরাত সম্বন্ধীয় আমলের বর্ণনা করিব। আমি এখন যে আয়াতটি পাঠ করিলাম, উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদান করিয়া বলিয়াছেনঃ 'তোমরা যাহা নগদ তাহা পছন্দ কর। আর আখেরাতকে ছাড়িয়াই দিতেছ।' ইহার সারমর্ম এই যে, যাহারা দুনিয়া গ্রহণ করিয়াছে, দুনিয়াতে লিপ্ত রহিয়াছে এবং আখেরাতকে ত্যাগ করিয়া বসিয়াছে, এই আয়াতে তাহাদের প্রতি সতর্কবাণী রহিয়াছে। মৌলবী শাব্বীর আহ্‌মদের এতদসম্পর্কীয় ওয়ায ছিল বিশ্বাস সংক্রান্ত। আর আমার ওয়ায হইবে আমল সংক্রান্ত। যেহেতু এল্‌ম বা বিশ্বাসের উদ্দেশ্য আমলই বটে; সুতরাং আমার অবলম্বিত বিষয়টি হইবে তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের পরিপূরক।

যদিও কতক এল্‌ম এমনও আছে যে, তদনুযায়ী আমল করার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু জ্ঞানলাভ বা বিশ্বাস করার পরিপ্রেক্ষিতেও তাহা উদ্দেশ্যযুক্ত। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকেরাও নিজ নিজ বিষয়ের দুইটি অংশ নির্ধারণ করিয়াছেন। এল্‌ম—জ্ঞানলাভ সম্বন্ধীয় এবং কর্ম সম্বন্ধীয়। যথা, তিব্ব শাস্ত্রেরই ধরুন, সমগ্র জগতই এই বিভাগ স্বীকার করিতেছে এবং এই উভয় অংশই কাম্যও বটে ; কিন্তু তথাপি গভীর দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, সেই কাম্য এল্‌মও প্রকারান্তরে কোন না কোন আমলের সহিত অবশ্যই সম্পর্ক রাখিতেছে। মনে করুন, খোদার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু আমলেও ইহার এমন বিশেষ ক্রিয়া রহিয়াছে যে, এই বিশ্বাস যেই স্তরের হয় আমলের সওয়াবও সেই স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

আরেফ এবং সাধারণ লোকের এবাদতের পার্থক্যঃ আরেফ অর্থাৎ, ওলীয়ে কামেল ও ছাহাবায়ে কেরামের এবং আমাদের এবাদতের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার ইহাই রহস্য। আওলিয়ায়ে কেরাম ও ছাহাবায়ে কেরামের এবাদত চাই কি আর্থিকই হউক কিংবা দৈহিক, উহার সমকক্ষ অন্য কাহারও এবাদত হইতে পারে না। ছাহাবায়ে কেরামের এবাদতের মধ্যে আমাদের তুলনায় কোন্ বিষয়টি অতিরিক্ত আছে? তাহা বিশ্বাস এবং খাঁটি নিয়ত ছাড়া আর কিছুই নহে। আওলিয়ায়ে কেরামের দুই রাকাআত নামায আমাদের দুই লক্ষ রাকাআতের চেয়ে উত্তম। কেননা, সেই দুই রাকাআতে বিশ্বাস ও খাঁটি নিয়ত এই পরিমাণ পাওয়া যায়, যাহা আমাদের এবাদতে কখনও উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। আমার হযরত পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছেনঃ "একজন ওলীর দুই রাকাআত নামায সাধারণ লোকের এক লক্ষ রাকাআত হইতে উত্তম।" হযরত ইহা ভুল বলেন নাই এবং ইহাতে বাড়াইয়া বা অতিরঞ্জিত করিয়াও কিছু বলেন নাই।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "আমার কোন ছাহাবী আধা সের পরিমাণ খাদ্য-শস্য খয়রাত করিলে উহা ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ খয়রাত করার চেয়েও অধিক সওয়াবের উপযোগী হইয়া থাকে।" যদি এই হাদীসের ভিত্তিতে আধা সের শস্যের মোকাবেলায় আধা সের স্বর্ণ লওয়া যায় এবং তুলনায় ওহুদ পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তখন উহার তুলনা বুঝিতে পারা যাইবে। আর যদি এইরূপে তুলনা করা হয় যে, অর্ধ সের শস্যের পরিবর্তে ইহার মূল্য সম্মুখে রাখিয়া স্বর্ণের মূল্যের সহিত তুলনা করা হয়, তবে তুলনায় আরও অধিক হইবে। আর এই সওয়াবের আধিক্য এল্‌মে মা'রেফাতের আধিক্যের কারণেই বটে। এই তুলনার সাহায্যে ছাহাবায়ে কেরামের এবাদত এবং আমাদের এবাদতের তুলনাও বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কেহ কেহ হয়তো বলিবেনঃ মৌলবী ছাহেবানও বিচিত্র মানুষ। কখনও এই হাদীসের কারণ মহব্বত এবং খাঁটি নিয়ত বলেন, আবার কোন সময় এল্‌ম ও মারেফাত বলেন, একই হাদীস দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতলব উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বলিতেছি যে, মহব্বত ও খাঁটি নিয়তের প্রেরণা এল্‌ম এবং মা'রেফাত হইতেই হাছিল হয়। আর তাহা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যেই পাওয়া যাইত। সুতরাং মূল একই। ইচ্ছা হয় ইহাকে খাঁটি মহব্বত বলেন, ইচ্ছা হয় এল্‌ম ও মারেফাত বলেন। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

عِبَارَاتُنَا شَتّٰى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ ـ وَكُلُّنَا اِلٰى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيْرُ

"আমাদের বর্ণনাভঙ্গি পৃথক, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য মাধুর্য একই এবং আমাদের সকলে একই সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি।" এই এল্‌ম ও মারেফাতের ফলেই তাঁহাদিগকে এমন বোধশক্তি

দান করা হইয়াছিল যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রাঃ) যখন হুযূর (দঃ)-কে প্রথমবার দেখিয়াছিলেন, যদিও তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে সংসর্গ লাভের পরবর্তী কালের ন্যায় হুযূরের প্রতি খাঁটি মহব্বত ছিল না, কিন্তু সত্যের অন্বেষণে যে পরিমাণ অকপট আগ্রহ ছিল, তাহারই ফলে দেখামাত্রই বলিয়া উঠিয়াছিলেনঃ هٰذَا لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ "ইহা মিথ্যাবাদীর চেহারা নহে।"

نور حق ظاهر بود اندر ولی ـ نیك بیں باشی اگر اهل دلی
مرد حقانی کی پیشانی کا نور ـ کب چهپا رهتا هے پیش ذی شعور

"ওলী লোকের ললাটে আল্লাহ্‌র নূর দীপ্তিমান থাকে। স্বচ্ছ হৃদয় লোক তাহা পরিষ্কার দেখিতে পান।"

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط

"তাঁহাদের চেহারায় অজস্র সজ্‌দার ফলে উজ্জ্বল নিদর্শন জ্বলজ্বল করিতেছে।" সেই ওলী কামেল ও খাঁটি হইয়া গেলে তখন কি অবস্থা হইবে?

جرعه خاك آمیز چوں مجنوں کند ـ صاف گر باشد ندانم چوں کند

"অপরিষ্কার পানির এক ঢোক পান করিয়া পাগল হইয়াছি। পরিষ্কার হইলে না জানি কি হইতাম!"

ছাহাবায়ে কেরামের এলমের স্বরূপঃ মোটকথা, ছাহাবায়ে কেরামের এলম ছিল খাঁটি। সুতরাং তাঁহাদের অনুসরণ করাই আমাদের পূর্ণ সৌভাগ্য। ছাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের কেন চলা উচিত? তাঁহাদের কর্মজীবন আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক কেন? একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

জগত জানে, রেলগাড়ী কিরূপে চলে। রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে ইঞ্জিনের গতি আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটি বগির সঙ্গে ইঞ্জিন থাকে না। তদ্রূপ হইলে গাড়ী চলিতে পারিত না; বরং এক সঙ্গে যুক্ত বহুসংখ্যক বগির জন্য একটিমাত্র ইঞ্জিন থাকে। ইহা পূর্ণ লাইনের জন্য যথেষ্ট হয়। নিয়ম এই যে, প্রথমে একটি বস্তুর মধ্যেই প্রাথমিক গতি আরম্ভ হয় এবং আরও অনেকগুলি বস্তুকে উহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। যেমন, রেলগাড়ীর সারিতে প্রথমে ইঞ্জিনের মধ্যে গতি আরম্ভ হয়; আর বহুসংখ্যক বগি উক্ত ইঞ্জিনের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর প্রাথমিক গতিবিশিষ্ট ইঞ্জিনটি একা শক্তিতে বহুদূর বিস্তৃত দীর্ঘ সারিটিকে কালকা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

একটি গতিশীল ইঞ্জিন যখন প্রাথমিকভাবে বহুসংখ্যক গাড়ীকে সহস্র সহস্র ক্রোশ টানিয়া লইয়া যায়, তখন ছাহাবায়ে কেরামের সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, ইহাতে বিচিত্র কিসের? অতএব, খোদার দরবারে পৌঁছিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত, ছাহাবায়ে কেরামের সহিত নিজকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া।

بود مورے هوسے داشت که در کعبه رسد ـ دست بر پائے کبوتر زد وناگاه رسید

"একটি পিপীলিকা কা'বা গমনের জন্য আগ্রহান্বিত ছিল। সে কবুতরের পা জড়াইয়া অকস্মাৎ কা'বা শরীফে পৌঁছিয়া গেল।"

একটি পিপীলিকা দরিদ্র এবং দুস্থ। হজ্জ করিতে যাওয়ার ইচ্ছা করিল। কিন্তু তাহার নিকট পথের সম্বল কিছুই ছিল না। এই চিন্তায় সে অস্থির ছিল। হাজীদের নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিল। হাজীরা বলিল ঃ জাহাজে এত দিন ভ্রমণ করিতে হয়। আবার উটের পিঠে এতদিন সফর করিতে হয়। তারপরে সহস্র সহস্র মাইলের সফর শেষ হয়। ইহাতে বড়ই কষ্ট করিতে হয়। সহস্র মাইলের সফর। শত শত টাকা ব্যয়। চোর-ডাকাতের ভয়। জীবনের আশঙ্কা। মোটকথা, ভীষণ কষ্ট সহ্য করার পরেই হজ্জ করা ভাগ্যে জোটে। বেচারা ইহা শুনিয়া একান্ত অস্থির ও নিরাশ হইয়া পড়িল। একদিকে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ, অপর দিকে নানাবিধ চিন্তা। এমতাবস্থায় হঠাৎ একজন পথপ্রদর্শক দেখিতে পাইল, যাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে ঃ

اے لقائے تو جواب ہر سوال ۔ مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

"তোমার সাক্ষাৎলাভই আমার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর; নিঃসন্দেহে তোমার দ্বারাই মুশ্‌কিল আসান হইবে।"

সে জিজ্ঞাসা করিল ঃ বল—কেমন অবস্থা? বেচারা দুঃখ-চিন্তায় জর্জরিত অবস্থায় বসিয়া ছিল। একজন ব্যথার দরদী পাইয়া কিঞ্চিৎ শান্তি পাইল এবং বলিল ঃ হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অন্তর মহব্বতে ও আগ্রহে পরিপূর্ণ। কিন্তু পথের সম্বল বলিতে কিছুই নাই। এই কারণেই চিন্তান্বিত ও অস্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। আপনি যদি কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বলিয়া দিন। সে বলিল ঃ "আচ্ছা, আমি একটি উপায় বলিয়া দিতেছি। তুমি গর্ব-অহংকার করিও না। গর্ব-অহংকারে উদ্দেশ্য সফল হয় না; বরং এরূপ জন সর্বদা বিফল হইয়া থাকে।" পিপীলিকা বলিল ঃ আমি আপনার কথায় সর্বপ্রকারেই সম্মত আছি। ইতিমধ্যে একটি কবুতর জঙ্গলে আসিয়া শস্যবীজ আহরণ করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি জানিত, এই কবুতরটি হরম শরীফে গমন করিবে। সে পিপীলিকাটিকে বলিল ঃ যদি তুমি কা'বা শরীফে যাইতে চাও, তবে এই কবুতরের পা জড়াইয়া ধর। গর্ব-অহঙ্কার করিও না। হরম শরীফে যাইতে পারিবে।

بود مورے ہوسے داشت کہ در کعبہ رسد ۔ دست بر پائے کبوتر زد وناگاہ رسید

অনুসরণে লজ্জার কারণ ঃ ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে কাহারও সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে কিংবা অনুসরণে লজ্জা, গর্ব বা অহংকারবোধ করিও না। ইহা বিফলকাম হওয়ার প্রমাণ। কোন পথপ্রদর্শকের সহিত সংযোগ স্থাপনে লজ্জা বা অহংকারবোধ করিলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। বিফলকাম হইয়া অর্ধ পথেই থাকিয়া যাইবে। মুসলমানদের মধ্যে এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অপরের অনুসরণে লজ্জাবোধ করিতে অনেককে দেখা যায়। ইহার কারণ আর কিছু নহে—তাহারা নিজকে বড় মনে করে, ধনী এবং সম্মানী ধারণা করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ প্রায়ই দরিদ্র এবং দুস্থ হইয়া থাকেন। কাজেই সাধারণ লোকেরা মনে করে—ইহাদের পদমর্যাদা নিম্ন। অর্থে দরিদ্র, অবস্থায় দুস্থ, পোশাক-পরিচ্ছদে মলিন। পক্ষান্তরে আমরা শ্রেষ্ঠ ধনী, মান-সম্মানের অধিকারী, আমাদের সঙ্গে ইহাদের সংযোগ কিরূপে সম্ভব? আমরা তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংযোগ কেমন করিয়া স্থাপন করিব? আফসোস! এই ছোট-বড়র কল্পনাই শয়তানকে আল্লাহ্‌র দরবার হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। এক্ষেত্রে শয়তান তো কেবল ইহাই বলিয়াছিল যে, "আমার চেয়ে নিম্ন মর্যাদার একটি অস্তিত্বকে, যাহা আমার চেয়ে হেয় এবং নীচ, কেন আমি সজদা করিব?" এই গর্ব এবং অহংকারই তো

তাহার সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল। ইহাই তাহাকে ধ্বংস করিয়াছে এবং তাহাই আমাদিগকেও বিনাশ করিতেছে। আজ মুসলমান সমাজে এই ব্যাধি অতিশয় ব্যাপক। প্রত্যেকটি মানুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত দেখা যায়।

আমি অভিযোগস্বরূপ বলিতেছি না; বরং সমাজের প্রতি স্নেহ ও মহব্বতবশত মন-দুঃখেই বলিতেছি। ভাই মুসলমান! এই ধারণা পরিত্যাগ করুন। আমাদের বিফলতার কারণ একমাত্র ইহাই, বিনাশের কারণও ইহাই। বাহিরের আকৃতির মোহই আমাদিগকে ধ্বংস করিতেছে। তত্ত্ববিদগণ বহিরাবয়ব সম্বন্ধে বলেনঃ

گر بصورت آدمی انسان بدے   احمد وبو جهل هم یکسان بدے
اینکه می بینی خلاف آدم اند   نیستند آدم غلاف آدم اند

“মানব-আকৃতিই যদি মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হইত, তবে আহমদ (দঃ) এবং আবু জাহ্‌ল সমান হইতেন। বাহিরে যে আকৃতি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা মনুষ্যত্বের বিপরীত। ইহা মানুষ নহে; বরং মানুষের খোলস মাত্র।” পোশাক-পরিচ্ছদকে ছোট-বড় হওয়ার মাপকাঠি করিও না। পোশাক দেখিয়া ছোট-বড়র বিচার করিও না। মৌলবী ছাহেব দশ টাকা বেতনে চাকুরী করেন। ময়লা ও টুটা-ফাটা কাপড় পরিধান করেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিও না। পোশাকের ভাল-মন্দের দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দ বুঝা যায় না। শরীঅত বাধ্য না করিলে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ এবং মা’রেফতদারগণ পায়জামাও পরিতেন না। দেহের সাজ-সজ্জার সহিত তাঁহাদের কোনই সম্পর্ক নাই।

نباشد اهل باطن درپے آرائش ظاهر - بنقاش احتیاجے نیست دیوار گلستاں را

“ফুলের বাগানের প্রাচীর যেমন চিত্রকরের মুখাপেক্ষী নহে, তদ্রূপ আহ্‌লে বাতেন (আত্মিক উন্নতিকামী)-দের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রয়োজন হয় না।”

উর্দু কবি ‘যওক’ কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

عریاں هی دفن کرنا تها زیر زمیں مجهے - لیك دوستوں نے اور لگادی کفن کی شاخ

“আমাকে মাটির নিম্নে খালি দেহে দাফন করাই উচিত ছিল, কিন্তু বন্ধুরা আবার কাফনের ঝামেলা লাগাইয়া দিয়াছে।”

এস্থলে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। কোন এক জাঁকজমক সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী বাদশাহ্‌র ভাই লুঙ্গি পরিয়া ঘুরাফেরা করিত। বাদশাহ্‌ ইহাতে লজ্জাবোধ করিতেনঃ “আমি এত বড় বাদশাহ্‌! আর আমার ভাই শুধু একখানা লুঙ্গি পরিয়া চলাফেরা করিতেছে।” বাদশাহ তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেনঃ “ভাই, তুমি পায়জামা পরিধান কর। তোমার লুঙ্গি পরা দেখিয়া আমার লজ্জা-বোধ হয়।” সে বলিলঃ “আমি পায়জামা পরিতে রাজী আছি যদি ইহার সহিত কোর্তাও হয়।” বাদ্‌শাহ্‌ বলেনঃ “কোর্তা অনেক আছে।” সে বলিলঃ “কোর্তার সহিত টুপিও চাই।” বাদশাহ্‌ বলিলেনঃ “টুপিও যথেষ্ট আছে।” সে বলিলঃ “তৎসঙ্গে জুতাও আবশ্যক।” উত্তর হইলঃ “জুতারও অভাব নাই।” সে বলিলঃ “এসমস্ত পোশাক পরিধান করিলে একটি ঘোড়ারও প্রয়োজন।” বাদশাহ্‌ বলিলেনঃ “ঘোড়াও অনেক রহিয়াছে।” সে বলিলঃ “ঘোড়ার জন্য আস্তাবলের দরকার এবং একজন সহিসও থাকা চাই।” বাদশাহ্‌ বলিলেনঃ “সবকিছুই প্রস্তুত রহিয়াছে।” সে আবার

বলিল ঃ "থাকার জন্য একটি বাড়ীও আবশ্যক।" উত্তর হইল, "জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট অট্টালিকাও তোমার জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে।" সে বলিল ঃ "তারপর একটি রাজত্বও হওয়া দরকার।" বাদশাহ্ বলিলেন ঃ "রাজত্বও হাযির, সিংহাসনে বস এবং সানন্দে রাজকার্য পরিচালনা কর।" ভাই এসমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বাদশাহ্‌কে বলিল ঃ "তবে আমি পায়জামাই কেন পরিব? এক পায়জামা পরিধানেই যখন এত ঝামেলা, তখন তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি বেশ আরামে আছি।" ফলকথা, যাঁহারা আল্লাহ্‌ওয়ালা, তাঁহারা এসমস্ত বহিরাড়ম্বরের ধার ধারেন না। সাদাসিধা জীবন যাপন করিয়া এবাদতে মশ্‌গুল থাকেন। তাঁহাদের অন্তরে এসমস্ত সাজ-সরঞ্জামের কোন মর্যাদাই নাই।

কোন এক বুযুর্গ লোক জনৈক বাদশাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যদি আপনি কোন স্থানে যাইয়া পথ ভুলেন এবং দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়েন, তখন কোন একজন লোক যদি আপনাকে বলে, আমি এক গ্লাস পানি অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে পারি। আপনি তদবস্থায় তাহা খরিদ করিবেন কি? বাদশাহ্ বলিলেন ঃ "নিঃসন্দেহ, আমি তখন অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়েই তাহা খরিদ করিব।" বুযুর্গ লোক আবার বলিলেন ঃ আচ্ছা, যদি এইরূপে কোন দিন আপনার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া আপনি মরণাপন্ন হইয়া পড়েন এবং কেহ তখন আসিয়া আপনাকে বলে, "আমি অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে প্রস্রাব খোলাসা করিয়া দিতে পারি, আপনি কি তাহাতে সম্মত হইবেন?" বাদশাহ্ বলিলেন ঃ "নিশ্চয়।" বুযুর্গ লোক তখন বলিলেন ঃ এখন ভাবিয়া দেখুন, আপনার রাজত্বের মূল্য কতটুকু—এক গ্লাস পানি এবং একবারের প্রস্রাব। এই মূল্যের বস্তু লইয়া এত গর্ব ও অহংকার করা এবং অন্যান্য লোককে ঘৃণার চক্ষে দেখা ও হীন মনে করা কতটুকু সঙ্গত বলা যাইতে পারে?

এখান হইতেই আজকালের উন্নতির অবস্থা হয়তো বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি উন্নতি করিতে নিষেধ করিতেছি না; বরং উন্নতি আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু একজন মুসলমানের পক্ষে যেরূপ উন্নতি করা উচিত, আমি তদ্রূপ উন্নতি চাই। এমন উন্নতি আমি কখনও পছন্দ করি না, যাহার পশ্চাতে পড়িয়া ধর্মকেই ভুলিতে হয় এবং আল্লাহ্‌র কল্পনাও আসে না। যাহারা আল্লাহ্‌কে চিনিয়া লয়, তাহারা দুনিয়াকে মোটেই ভালবাসে না।

آں کس که ترا شناخت جاں را چه کند ۔ فرزند وعزیز وخانماں را چه کند

"যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার আবার জীবন, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত কি সংস্রব?"

আল্লাহ্‌ওয়ালার দৃষ্টিতে দুনিয়া ঃ তাঁহাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অস্তিত্ব তৃণখণ্ডের চেয়ে অধিক নহে। শিশুরা মাটির খেলাঘর এবং বিভিন্ন প্রকার খেলনা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বোধমানগণ ইহা দেখিয়া হাসেন এবং বালক-বালিকাগণকে দেখাইয়া বলেন ঃ এই পাগলদের কাণ্ড-কারখানা দেখ। এইরূপে আল্লাহ্‌ওয়ালা আরেফগণ আপনাদের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ দেখিয়া আপনাদিগকে ইহার মোহ ত্যাগপূর্বক পরলোকের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে ইহার মোহ ত্যাগপূর্বক পরলোকের প্রতি লক্ষ্যহীন দেখিলে আপনাদের অবস্থার প্রতি তাঁহারা হাসেন এবং আফসোস করিয়া বলেন ঃ

دلا تاکے دریں کاخ مجازی ۔ کنی مانند طفلاں خاکبازی

"হে মন! এই মিথ্যা প্রাসাদে শিশুদের মাটির খেলার ন্যায় আর কতকাল খেলা করিবে?"

توئی آں دست پرور مرغ گستاخ ۔ بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ

“হে আমার নিজ হস্তে প্রতিপালিত অবাধ্য পাখী! তোর বাসা এই মাটির ঘরের বাহিরে ছিল।”

چرا زاں آشیاں بیگانه گشتی ۔ چو دو ناں چغدایں ویرانه گشتی

“তুই নিজের সেই বাসাকে কেন ভুলিয়া রহিয়াছিস? পেঁচকের ন্যায় পোড়োবাড়ীতে ঘুরিতেছিস?”

অতএব, এই বিলাসের সামগ্রীকে নিজের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কাম্য করিয়া লইও না এবং দরিদ্র ও দুস্থ, অপরিষ্কার ও ছেঁড়া-ফাটা পোশাকধারী ওলামাকে ঘৃণা ও অবহেলার চক্ষে দেখিও না। তাঁহারাই খোদার দরবারের বিশিষ্ট লোক, তাঁহারাই সঙ্গে কিছু লইয়া সেই দরবারে যাইবেন। আমি বলিতেছি না যে, দুনিয়া ছাড়িয়া দাও এবং সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেল; বরং আমার উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার মোহে এত গভীরভাবে মত্ত থাকিও না যে, একেবারে খোদাকেই ভুলিয়া যাও; বরং দুনিয়াকে ঘৃণার চক্ষে দেখ এবং খোদার বিশিষ্ট ও প্রিয় বান্দাগণকে সম্মান কর। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ রাজত্ব এবং শাসন-ক্ষমতার কোন পরোয়া করেন না; বরং তাঁহারা ইহাকে জানের জন্য বোঝাস্বরূপ মনে করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, হযরত গাউছে আ'যমের সমীপে সান্‌জারের সুলতান চিঠি লিখিয়াছিলেন, আপনার দরবারের সেবকবৃন্দের জন্য আমার রাজ্যের এক অংশ আপনাকে দান করিতেছি। তিনি উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন:

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاه باد ۔ در دل اگر بود هوس ملك سنجرم
زانگه که یافتم خبر ملك نیم شب ۔ من ملك نیم روز بیك جو نمی خرم

“যদি সান্‌জার রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে উদিত হয়, তবে আমার ভাগ্যাকাশ সান্‌জারের রাজছত্রের ন্যায় কাল হউক। যখন হইতে আমি মধ্যরাত্রির রাজত্বের সন্ধান পাইয়াছি, তখন হইতে অর্ধ দিবসের রাজত্বকে একটি যবের বীজের বিনিময়েও খরিদ করি না।”

কোন এক আল্লাহ্‌ওয়ালা বলেন:

بفراغ دل زمانے نظرے بماهروئے ۔ به ازاں که چتر شاهی همه روز هائے وهوئے

“এই রাজছত্র এবং দিবা-রাত্রির শোরগোল অপেক্ষা যমানার দুঃখ-কষ্ট হইতে অবসর থাকা, প্রিয়জনের সুন্দর মুখশ্রীর প্রতি একটিবার দৃষ্টি করা বহুগুণে উত্তম।”

যেই দুস্থ অবস্থাকে তোমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ, তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেন:

اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ “আমি ভগ্নহৃদয় দুস্থ লোকদের সঙ্গে আছি।” এই দুস্থ অবস্থা বরণ করা খোদার সহিত মিলনের শর্তও বটে। মাওলানা রূমী বলেন:

فهم وخاطر تیز کردن نیست راه ۔ جز شکسته می نگیرد فضل شاه
هرکجا پستی ست آب آنجا رود ۔ هرکجا مشکل جواب آنجا رود
هرکجا دردے شفا آنجا رود ۔ هرکجا رنجے دوا آنجا رود

“হৃদয় ও জ্ঞানের প্রখরতা পথ পরিচয়ের প্রমাণ নহে; দুস্থ অবস্থার লোকই রাজকীয় সম্মান লাভ করিয়া থাকে। নীচু স্থানের দিকেই পানি গড়ায়, যথায় মুশ্‌কিল তথায় আসান। যথায় ব্যথা তথায়ই আরোগ্য, যেখানে দুঃখ-কষ্ট, সেখানেই ইহা মোচনের ব্যবস্থা।”

খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার সঠিক পন্থা ঃ আমাদের মনে চাহিদা বা কামনা নাই, তাহা থাকিলে আনুগত্য অবলম্বনে বা অনুসরণে নিজকে হেয় করাকেও গৌরবের বস্তু মনে করা হইত। কেহ কাহারও প্রতি আশেক হইলে প্রেম-পাত্রী যদি প্রেমিককে বলেন ঃ "সর্বাঙ্গের কাপড়-চোপড় খুলিয়া লেঙ্গুট পরিধান কর, তবেই মিলন হইবে।" আল্লাহ্‌র শপথ, তৎক্ষণাৎ সে তাহা করিবে ; লেঙ্গুট পরিধান করিতে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধা হইবে না। সমস্ত লজ্জা-শরম ত্যাগ করিয়া বসিবে, কিন্তু খোদার জন্য কেহ এরূপ করিতে প্রস্তুত হয় না। অথচ ঃ

عشق مولٰی کئے کم از لیلٰے بود ۔ گوئے گشتن بهر او اولٰی بـود

"মাওলার প্রেম কি লায়লার প্রেম হইতে কম ? তাহার প্রেমে বলের মত দলিত হওয়াও উত্তম।"

ইহার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখুন, রাসায়নিকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। সকলেই জানে, তাহারা বিবস্ত্র ও অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর লোক ছাড়াও রাজা-বাদশাহগণ পর্যন্ত একটি পুরাতন ও অপরিস্কার হুক্কা হস্তে তাহাদের পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, যদিও তাহারা সত্যিকারের রাসায়নিক নহে। "আল্লাহ্ আকবর !" এই স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর জন্য তাহারা নিজের সুখ-শান্তি এবং মান সম্মান পর্যন্ত বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে! কিন্তু যে সমস্ত মহাপুরুষ প্রকৃতপক্ষে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহাদের কাছেও কেহ ঘেঁষিতে চায় না। তাঁহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইলে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কেননা, স্বর্ণ প্রস্তুতকারক বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারাই।

সারকথা এই যে, আপনারাও ছাহাবায়ে কেরামের সহিত সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক তাঁহাদের উছিলা অন্বেষণ করিলে নির্ঘাত কৃতকার্য হইবেন। কেননা, খোদার দরবার পর্যন্ত পৌঁছিবার সঠিক পন্থা-প্রদর্শক একমাত্র তাঁহারাই। যদ্রূপ পিপীলিকা কবুতরের পা ধরিয়া পবিত্র কা'বা শরীফে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিল, তদ্রূপ আমরাও ছাহাবায়ে কেরামের পা ধরিয়া আল্লাহ্‌র দরবার পর্যন্ত কেন পৌঁছিতে পারিব না ? পৌঁছিতে পারিব—অবশ্যই পৌঁছিতে পারিব। ছাহাবায়ে কেরামের উছিলা হাছিল করিলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলা লাভ করা যায়। সুতরাং সফলতা লাভ করা স্থির নিশ্চিত।

বস্তুত মা'রেফাত এবং এল্‌মের বদৌলতই ছাহাবায়ে কেরাম এরূপ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। এল্‌ম ও মা'রেফাতের মর্যাদা অনেক উচ্চ। এল্‌ম ও মা'রেফাত বস্তু বলিয়া গণ্য না হইলে জগতে কোন বস্তুই নাই বলিতে হইবে। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার সম্পর্কও আমলেরই সহিত। আমল ব্যতিরেকে এল্‌ম ও মারেফাতের এমন কোন উপকারিতা নাই। কিন্তু আজকাল তালেবে এল্‌মদের মধ্যে কিছু কিছু এল্‌মের অহংকার দেখা যাইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, অর্জিত এলম তাহাদের বিরাট সম্পদ। এল্‌মের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা যেন এক বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছে। আক্বীদা তাহাদের অবশ্যই নিখুঁত আছে, কিন্তু আমল ঠিক নাই। মহা প্রমাদ এই যে, তাহারা শুধু জ্ঞান এবং বিশ্বাস অর্জন করাকেই প্রধান বিষয় মনে করিয়া থাকে। আমলের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি তাহাদিগকে বলি ঃ "তোমরা আক্বীদা ও বিশ্বাসের গৌরবে আমল ঠিক করিতেছ না। বস্তুত এল্‌ম এবং মারেফাতের পরে হইলেও আমলই মুখ্য বিষয়।

সবকিছুই আমলের উপর নির্ভরশীল ঃ কনৌজে এক আহ্‌লে-হাদীস ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে সে বলিতে লাগিল ঃ "জনাব ! আমরা শুধু নামাযের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি

মাস্‌আলাতেই হাদীস অনুযায়ী আমল করিয়া থাকি। অন্যান্য ব্যাপারে হাদীসের নামও লই না। দেখুন, আমি একজন আতর ব্যবসায়ী; উহার সহিত তেলও মিশাইয়া থাকি। ফলকথা, আমলের দিক হইতে আমরা খুবই দুর্বল।” এইরূপে মনে করুন, আমরা হানাফী, আমাদের আক্বীদা ঠিক আছে। কিন্তু আমলের ত্রুটি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছে। অথচ আমল সেই বস্তু, যাহার উপর অন্যান্য সমস্ত বস্তুই নির্ভরশীল। যদ্যপি কতিপয় এল্‌ম ও মা'রেফাত এমনও আছে, যাহাদের সহিত আমলের তেমন সম্পর্ক নাই; বরং সে সমস্ত বিষয়ে কেবল জ্ঞান লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু কোরআন ও হাদীস শরীফ দেখিলে বুঝা যায়, উহাদের লক্ষ্য আমল হইতে শূন্য নহে।

তক্‌দীর সম্বন্ধে তা'লীমের ফল ঃ আল্লাহ্ পাক স্বীয় কালামে মজীদে বলিতেছেন ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتَاكُمْ ط

অর্থাৎ, “তোমাদের প্রতি যে সমস্ত আনুষঙ্গিক কিংবা ব্যক্তিগত বিপদ-আপদ আসিয়া থাকে, তাহা বহু পূর্বেই আমি এক দফতরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।” এই আয়াতটিতে আল্লাহ্ পাক তক্‌দীর সম্বন্ধে তা'লীম দিয়াছেন। ইহা একটি শিক্ষা, কিন্তু এই শিক্ষার মধ্যে একটি কর্মগত উদ্দেশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ “আমি তক্‌দীরের তা'লীম কেন দিলাম? এই জন্য যে, যাহা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় তজ্জন্য দুঃখ করিও না, আর যাহা হস্তগত হয় তাহাতে গর্বিত হইও না।” এই তা'লীমের মধ্যে এক সৌন্দর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে মানুষের স্বভাব অনুযায়ী কথাটি বলিয়া দিয়াছেন। কেননা, দুঃখ-কষ্ট মানবের স্বভাবগত বিষয়। এই তা'লীমের ফলে দুঃখ-কষ্টের ক্ষেত্রে স্বভাবত সান্ত্বনা ও শান্তি পাওয়া যাইতে পারে এবং নানাবিধ বিপদে এই তা'লীম শান্তি লাভের কারণ হইতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী লোক একত্রিত হইলেও এমন সুন্দর উপায় বলিয়া দিতে পারিবে না। ফলকথা, তক্‌দীরের মাসআলা শিক্ষা দেওয়ার একটি উদ্দেশ্য সান্ত্বনা, শান্তি এবং ধৈর্যধারণও বটে। যেমন, لِكَيْلَا تَاْسَوْا বাক্যে তাহা পরিষ্কার বলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যের সার্থকতা দিবালোকের মত স্পষ্ট। একটি কল্পিত ঘটনা হইতে আপনারা এই কথাটি বুঝিতে পারিবেন।

মনে করুন; দুইজন লোক একই স্থানের অধিবাসী এবং সর্বপ্রকারে দুইজনের একই রকমের অবস্থা। কিন্তু পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একজন তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী, অপরজন তকদীর বিশ্বাস করে না। দুইজনের দুইটি ছেলে একই বর্ণের, একই গুণের এবং একই শিক্ষায় শিক্ষিত। দুইজনের পিতা-মাতাই ছেলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বহু উচ্চ আশা পোষণ করিতেছেন। ঘটনাক্রমে দুইটি ছেলেই ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। দুইজনকেই একই চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন রাখা হইল। কিন্তু চিকিৎসকের ভুলক্রমে তাহার চিকিৎসা একজনের পক্ষেও হিতকর হইল না, ফলে দুইটি ছেলেই মরিয়া গেল। এমতাবস্থায় উভয়ের পিতা-মাতাই অতিশয় দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইবেন। কিন্তু ইহাদের দুঃখ-কষ্টের তারতম্য এখানে কেবল তকদীরের মাসআলা দ্বারাই হইবে। যিনি তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হইয়া পড়িবে— لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ‘আমাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌র তরফ হইতেই আসিয়া থাকে।’ فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَايَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ ‘খোদার কার্য হেকমত বা যুক্তিশূন্য নহে।’

হযরত খেযের (আঃ) যেই ছেলেটিকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা শুধু হিতের জন্যই ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা কোন মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য ভিন্ন কোন কাজ করেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমার পিতা মরহুমের এন্তেকালের পর একজন বেদুইন আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলঃ

اِصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِيْنَ اِنَّمَا ـ صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّاْسِ

"আপনি ধৈর্য ধরুন, আপনি বড়, আমরা ছোট, আপনার ধৈর্য দেখিয়া আমরা ধৈর্যধারণ করিব।"

خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ اَجْرُكَ بَعْدَهٗ ـ وَاللّٰهُ خَيْرٌمِّنْكَ لِلْعَبَّاسِ

"আপনার পিতার মৃত্যুতে আপনাদের মধ্যে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং আপনারা উভয়েই উপকৃত হইয়াছেন। আপনি ধৈর্যধারণের সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন, যাহা আব্বাসের চেয়ে উত্তম। আর আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি তাঁহার জন্য আপনার চেয়ে উত্তম। যখন এই মৃত্যুতে আপনাদের মধ্যে কাহারও কোন ক্ষতি হইল না, তখন ইহার জন্য দুঃখ কিসের?" তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী জনৈক বেদুইনের এই উক্তি দেখুন, ইহা হইতে কেমন সুন্দর সান্ত্বনা লাভ করা যাইতে পারে!

অপর ব্যক্তি—যিনি তকদীর বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেনঃ চিকিৎসকের চেষ্টার অভাবেই আমার ছেলেটি মারা পড়িল। ডাক্তার যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিলে ছেলেটি কখনই মরিত না, ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করিব। যেমন চিন্তা তেমন কাজ, ডাক্তারের বিরুদ্ধে কেস করা হইল। ফলে ডাক্তার বেচারার জেল হইল, কিন্তু তবুও মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার অন্তর হইতে সেই শোক-তাপ দূরীভূত হইল না যে, ডাক্তারের চেষ্টার ত্রুটি না হইলে ছেলেটি মরিত না। ইহাতে বুঝা যায় যে, তক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাস করিলে শোক-দুঃখের আয়ু দুই-এক সপ্তাহের অধিক হয় না। কেননা, তক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাসের কারণে সে যেই সান্ত্বনা লাভ করে, তাহাতেই শোক-তাপ দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে তক্‌দীর অবিশ্বাসকারীর দুঃখ চিরস্থায়ী থাকিয়া যায়। এইরূপে প্রত্যেক এল্‌মে এবং প্রত্যেক আক্বীদায় একটি কর্মগত উদ্দেশ্য আছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ ভাগে প্রথম আসমানে অবতরণ করিয়া থাকেন।" ইহার উপর প্রশ্ন করা হয়; "গতিশীলতা আল্লাহ্ তা'আলার শান-বিরোধী।" প্রকৃতপক্ষে এই হাদীসের উদ্দেশ্যগত আমলের প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে না; বরং হাদীসটি শ্রবণ করা মাত্রই মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হইত যে, শেষ রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার জন্য অধিকতর চেষ্টা ও গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কেননা, তাহা নৈকট্য ও কবূলিয়তের সময়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি হইতে বিষয়টি বুঝিতে পারিবেন।

কোন শাসক বা অফিসার ভ্রমণে বাহির হইয়া কোন স্থানের নিকটবর্তী হইলে যদি লোকে আসিয়া সংবাদ দেয় যে, অমুক অফিসার এখান হইতে ৬ মাইল নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, শীঘ্রই এখানে আসিবেন। ইহা শুনিয়া তথাকার কর্মচারিগণ যদি বলে যে, গতকল্য এতদূরে ছিল, আজ এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া এত নিকটে কেমন করিয়া আসিলেন? তবে বুঝা যাইবে যে, তাহারা ঠিকমত নিজের কর্তব্য কাজ করে না। অন্যথায় নিকটে আসার উপায় অনুসন্ধান না করিয়া নিজেদের কাজ-কর্ম দুরুস্ত করার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এত নিকটবর্তী হওয়ার কথা হাদীসে এই উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়—যেন তাঁহার নিকটে আসার কথা জানিতে পারিয়া মানুষ নিজ নিজ কর্তব্যের প্রতি সচেতন ও সতর্ক হয় এবং তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়া অবস্থার ভাষায় বলিতে থাকে ঃ

امروز شاه شاهاں مهماں شده است ما را - جبرائيل با ملائك درباں شده است ما را

"আজ সমস্ত বাদশাহ্দের বাদশাহ্ আমাদের এখানে অতিথি হইয়াছেন এবং জিব্রাঈল তাঁহার সমস্ত ফেরেশ্‌তা সঙ্গিগণসহ আমাদের দ্বারবান হইয়াছেন।"

প্রসঙ্গক্রমে হযরত মাওলানা ইয়াকূব মরহুমের একটি কাহিনী আমার মনে পড়িল। তিনি হাদীস পড়াইতেছিলেন ঃ "যে ব্যক্তি নূতন ওযূর সহিত দুই রাকাআত নামায পড়ে এবং তাহাতে নামাযের সহিত সম্পর্কহীন কোন চিন্তা না করে, তবে তাহার অতীতকালের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়।" জনৈক তালেবে এল্‌ম বলিয়া উঠিল ঃ "হযরত! নামাযের মধ্যে কোন প্রকার চিন্তা না আসে, ইহাও কি সম্ভব?" তিনি বলিলেন ঃ "কখনও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছ, না এমনিই সন্দেহ করিতেছ?"

ফলকথা, শব্দের কারণ অনুসন্ধান রোগের আলামত, এসমস্ত ত্যাগ করিয়া শুধু কাজ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম কোন সময় হুযূর (দঃ)-কে এই জাতীয় বিষয় জিজ্ঞাসাও করেন নাই, প্রশ্নও করেন নাই।

বিজ্ঞান এবং দর্শনের তথ্যানুসন্ধান ঃ কোন এক ব্যক্তি এক বুযুর্গ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিল ঃ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মে'রাজ শরীফে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কি কি আলাপ করিয়াছিলেন? উক্ত বুযুর্গ লোক কেমন সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন ঃ

اكنوں كرا دماغ كه پرسد ز باغباں - بلبل چه گفت وگل چه شنيد وصبا چه كرد

"এখন কাহার এত সাহস যে, বাগানীকে জিজ্ঞাসা করিবে—বুলবুল কি বলিয়াছে, ফুল কি শুনিয়াছে এবং প্রাতঃসমীরণ কি করিয়াছে?"

আর একজন কবি বলিয়াছেন ঃ

تو نه ديدى گهے سليمان را - چه شناسى زبان مرغاں را
عنقا شكار كس نه شود دام بازچيں - كيں جا هميشه دام بدست است دام را

"তুমি কখনও সোলায়মান (আঃ)-কে দেখ নাই, পাখীর ভাষা কেমন করিয়া জানিবে? আনকা পক্ষী কাহারও ফাঁদে ধরা দেয় না। ফাঁদ তুলিয়া লও। এখানে সর্বদা ফাঁদে বায়ু ভিন্ন আর কিছুই ধরা পড়ে না।"

কারণ, তোমাদের বুদ্ধির দৌড় যতটুকু, আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা তাহা অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী। إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ "আল্লাহ্র ক্ষমতা যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।" বেষ্টনকৃত বস্তু বেষ্টনকারীকে কেমন করিয়া বুঝিবে? পানির কোন পোকা মাথা তুলিয়া দুনিয়ার বড় বড় সরঞ্জাম দেখিতে পাইবে এবং খোদার হেকমতে দুনিয়া পরিপূর্ণ দেখিবে; কিন্তু এই সমুদয়ের রহস্য ও তথ্য সে কেমন করিয়া বুঝিবে? এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞানীদের উপদেশ ঃ

حديث مطرب مى گو وراز دهر كمتر جو - كه كس نه كشود و نه كشايد بحكمت ايں معمار را

“গায়ক এবং শরাবের আলোচনা কর, কিন্তু যমানার রহস্যসমূহের অনুসন্ধান করিও না। এই ধাঁধা কেহই বুদ্ধিবলে খুলিতে পারে নাই। কাহারও দ্বারা কোন সময় ইহা খোলা সম্ভবও হয় নাই।” ইহার চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি—কোরআন ও হাদীসের সাহায্যে পার্থিব বিদ্যার প্রমাণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাওয়া। আজকাল বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন মাসআলা শুনিলেই তাহা কোরআন মজীদের সঙ্গে মিল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কোরআনে মজীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিষয় অনুসন্ধান করা এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির তথ্য খোঁজ করা বাতুলতা বৈ আর কি হইতে পারে ? গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কোরআনে যাহাকিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল তওহীদের প্রমাণের জন্যই আসিয়াছে। ইহা সম্বন্ধে কোরআনে অধিক বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। মোটামুটি জ্ঞানই যথেষ্ট। যেমন, একজন নিরক্ষর বেদুইন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছিলঃ

اَلْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ وَالْاَثْرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيْرِ فَالسَّمَآءُ ذَاتُ الْاَبْرَاجِ وَالْاَرْضُ
ذَاتُ الْفِجَاجِ كَيْفَ لَايَدُلَّانِ عَلَى اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ ○

“উটের বিষ্ঠা উটের সন্ধান দেয়, পদচিহ্ন কাহারও হাঁটিয়া যাওয়ার প্রমাণ দেয়। তবে এই কক্ষপথবিশিষ্ট আসমান, প্রশস্ত গিরিপথবিশিষ্ট যমীন আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবে না কেন ?” কোরআন মজীদে বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুসন্ধান করা ঠিক ‘তিব্বে আকবর’ গ্রন্থে জুতা সেলাইয়ের প্রণালী অনুসন্ধান করারই অনুরূপ। কোরআন মজীদ “তিব্বে আকবর।” ইহা জুতা সেলাইয়ের কিতাব নহে। কোরআন মজীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং নফসের সংশোধন-প্রণালী পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের অনর্থক আলোচনার সহিত কোরআনের কি সম্পর্ক ? ‘তওহীদ’ প্রমাণের উদ্দেশে যদি কোন বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাস্‌আলা লইয়া প্রয়োজন পরিমাণ আলোচনা কোরআনের মধ্যে হইয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে কোন কথা নাই। কিন্তু কোরআন মজীদকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ মনে করা মহাভুল। খোদার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে এবং জগতের যাবতীয় পদার্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে ছাহাবায়ে কেরাম কোন প্রকার আলোচনা না করাতেই বুঝা যায়, এসমস্ত বিষয় প্রয়োজনের বাহিরে। কোন সত্যিকারের মুসলমানের সঙ্গে এসমস্ত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং সে সমস্ত এল্‌মই কাম্য, যাহার পরিণামে কোন কর্মগত উদ্দেশ্যও রহিয়াছে। যেমন, তকদীরের মাস্‌আলা এবং আল্লাহ্ তা'আলার অবতরণ সম্বন্ধীয় হাদীসে আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। তওহীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী হইতেও এইরূপ বুঝা যাইতেছেঃ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ এই সূরার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যখন খোদা তা'আলাকে এইরূপে বুঝিতে পারিবে, তখন লোভে কিংবা ভয়ে খোদা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিবে না। অফিসারের নৈকট্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন প্রজাসাধারণকে ভয় করে না, তদ্রূপ এক খোদার উপাসক খোদা ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না।

এক সময় জঙ্গলের মধ্যে ভ্রমণকালে কোন এক গ্রাম্য লোকের সহিত আকবর বাদশাহের বন্ধুত্ব হইয়া গেল। আকবর তাহাকে বলিলেনঃ কোন সময় প্রয়োজনবোধ করিলে দ্বিধাহীনভাবে আমার বাড়ীতে চলিয়া যাইও। একদা সে কোন প্রয়োজনে আকবরের দরবারে আসিয়া দেখিল, তিনি নামায পড়িতেছেন এবং নামাযান্তে দোআ করিতেছেন। গ্রাম্য লোকটি যখন দেখিল যে, বাদশাহ স্বয়ং খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। তখন সে ভাবিল, তবে আমি বাদশাহের নিকট না চাহিয়া

খোদার নিকট চাহিতে পারি না কি ? সে আকবর বাদশাহ্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিল ঃ "তোমার দয়ার প্রয়োজন নাই, আমি তাঁহার নিকট হইতেই চাহিয়া লইব। তিনি তোমাকে লাখে লাখে দিতেছেন —আমাকে দিবেন না কেন ?" প্রকৃত তওহীদের ইহাই ফল ঃ

موحد چه بر پائے ریزی زرش - چه فولاد هندی نهی بر سرش
امید وهراسش نه باشد ز کس - همیں است بنیاد توحید وبس

"তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির পদতলে ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত রাখিয়া দাও না কেন, হিন্দী তরবারি তাহার মাথার উপর ধারণ কর না কেন, সে ধন-সম্পদের লোভও করিবে না এবং তরবারির ভয়েও কম্পিত হইবে না। ইহাই তওহীদের ভিত্তি।"

চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, আক্বীদা সম্বন্ধীয় মাসআলাসমূহে নাজাতের উদ্দেশ্য ছাড়া আরও অনেক উদ্দেশ্য কর্ম সম্বন্ধীয়ও রহিয়াছে। সুতরাং আমলের সঙ্গে যখন এল্‌মের এরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, অতএব, মৌলবী শাব্বীর আহমদ ছাহেব আখেরাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তৎসঙ্গে আমলের বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়াও প্রয়োজন মনে করিতেছি।

আলেমদের সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা ঃ আলেমদের সংশ্রব সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার উদ্দেশেই আমি আমার পঠিত আয়াতটি অদ্যকার ওয়াযের বিষয়বস্তুরূপে অবলম্বন করিয়াছি। এই আয়াতটি আমলকেও প্রয়োজনীয় বলিতেছে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অভিযোগ করিতেছেন, মানুষ দুনিয়ার মহব্বতে মত্ত রহিয়াছে এবং আখেরাতকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দুনিয়ার মহব্বতের অর্থ দুনিয়াকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করা এবং আখেরাতের চিন্তা আদৌ না থাকা। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত কেহ কেহ সাধারণত কেবল দুনিয়া অর্জনকেই সংসারাসক্তির অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া এই শিক্ষার প্রতিও বিদ্রূপ করে এবং এই শিক্ষাপ্রাপ্তদের দৃষ্টান্ত বর্ণনায় বলে ঃ

কোন এক বাদশাহ্‌র দরবারে আলেমদের প্রাধান্য ছিল। বাদশাহ্ তাহাদের মরজী অনুসারে চলিতেন। একদিন মৌলবী ছাহেবগণ বাদশাহ্‌কে বলিলেন ঃ "বাদশাহ্ নামদার ! এই সৈন্য-সামন্ত ও আমলা-কর্মচারীর ঝামেলায় ফায়দা কি ? অনর্থক ব্যয়বাহুল্য। সমস্ত সৈন্য বরখাস্ত করিয়া দেওয়া উচিত।" বাদশাহ্ তাহাই করিলেন। শত্রু-রাজা যখন জানিতে পারিল যে, অমুক বাদশাহ্ সৈন্যবাহিনীকে বরখাস্ত করিয়া দিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিল। বাদশাহ্ মৌলবী ছাহেবগণকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "শত্রু-রাজা আমার রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" মৌলবী ছাহেবগণ বলিলেন ঃ "কোন চিন্তা নাই, আমরা আপোষে মীমাংসা করিয়া দিব।" তাঁহারা যাইয়া শত্রুপক্ষকে বুঝাইলেন ঃ "ইহা বড় নিন্দনীয় কাজ। পরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া ভয়ঙ্কর পাপজনক। এমন জঘন্য কাজ করা উচিত নহে।" শত্রু কি কখনও উপদেশ শুনিয়া রাজ্যলোভ ত্যাগ করিতে পারে ? অগত্যা তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বাদশাহ্‌কে বলিলেন ঃ "সে তো উপদেশ মানে না, আপনিই ছাড়িয়া দিন। আপনার রাজ্য গেল, তাহার ঈমান গেল।" এইরূপে মৌলবীদের কথামত চলিতে গেলে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বসিতে হইবে। আমি কসম করিয়া বলিতে পারি—এসমস্ত দুনিয়াদার লোক আলেমদের সংস্পর্শে আসিতেছে না বলিয়া তাঁহাদের প্রতি এমন দোষারোপ করিতেছে। আলেমদের সংসর্গে থাকার জন্য কিছু সময় বাহির করিয়া লও। অধিক নহে, অন্তত চল্লিশ দিনই হউক।

দুঃখের বিষয়, নিজেদের দৈহিক রোগের চিকিৎসার জন্য চাকুরী হইতে বিনা বেতনে ছুটি লইতেছ। গৃহকর্মের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া টাকা-পয়সাও ব্যয় করিয়া থাক। দৈহিক রোগের জন্য চাকুরীহীন থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও মঞ্জুর। ডাক্তারকে ১৬ টাকা ফি দেওয়া মঞ্জুর। কিন্তু আত্মিক রোগের জন্য কিছুই চেষ্টা-তদবীর করিতেছ না। আরবী শিক্ষাপ্রাপ্ত রূহানী রোগের সিভিল সার্জন মৌলবী ছাহেবদের নিকট অতি অল্পকাল মাত্র (৪০ দিন) অবস্থান করিয়া রূহানী রোগের চিকিৎসা করাইলে সমস্ত প্রশ্নের ও সন্দেহের উত্তর প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত কার্যই চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হইয়া থাকে। যেহেতু দৈহিক রোগ হইতে আরোগ্যলাভ কাম্য হয়। সুতরাং ইহার জন্য সর্বপ্রকার ক্ষতি এবং কষ্টবরণ করিয়া লওয়া হয়। পক্ষান্তরে রূহানী রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা নিজেদেরই কাম্য নহে। আফসোস! রূহানী রোগ দূরীকরণের নিমিত্তও যদি দৈহিক রোগের ন্যায় চেষ্টা করা হইত—কতই না মঙ্গল হইত! কোন একজন তত্ত্বানুসন্ধানবিদের সংসর্গে ৪০ দিন অবস্থান করা কি কোন কঠিন কাজ? ইন্‌শাআল্লাহ্ তাঁহার সাহচর্যই সর্ববিধ সন্দেহ অপনোদনের জন্য যথেষ্ট হইবে। কোন প্রকার আলোচনা-সমালোচনার প্রয়োজন হইবে না।

اے لقائے تو جواب ہر سوال ۔ مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

“কামেল পীরের সন্দর্শনই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার দ্বারা সর্ববিধ মুশ্‌কিল আসান হইয়া যায়।” ইহার প্রমাণ—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লও। মাওলানা রূমী বলেনঃ

آفتاب آمد دلیل آفتاب ۔ گر دلیلت باید ازوی رو متاب

“সূর্যই সূর্যের প্রমাণ। যদি প্রমাণ আবশ্যক হয়—তাহা হইতে মুখ ফিরাইও না।” আমি যে আলেমের সংসর্গে নির্দিষ্ট করিয়া ৪০ দিন অবস্থান করার কথা বলিয়াছি, তাহা হাদীসের মর্মানুসারেই বলিয়াছি। এক হাদীসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি খাঁটি নিয়তে ৪০ দিনব্যাপিয়া নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার কাজে উৎসর্গ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তর হইতে হেকমত বা তত্ত্বজ্ঞানের নহর জারি করিয়া দেন। কিন্তু মনে রাখিবেন, কোন পার্থিব উদ্দেশে আলেমের সংসর্গে থাকিলে তাহাতে আখেরাতের ফায়দা কিছুই হইবে না।

যেমন, কোন এক গ্রাম্য অসভ্য লোককে এক মৌলবী ছাহেব বলিয়াছিলেনঃ তুমি একাধারে ৪০ দিন নামায পড়িলে আমি তোমাকে একটি মহিষ দিব। সে বলিলঃ “বহুত আচ্ছা।” চল্লিশ দিন পরে গ্রাম্য লোকটি আসিয়া মৌলবী ছাহেবের নিকট চল্লিশ দিন একাধারে নামায পড়িয়াছে জানাইয়া মহিষ দাবী করিল। মৌলবী ছাহেব বলিলেনঃ “আমি তো শুধু এই জন্য তোমাকে মহিষ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, মহিষের আশায় নামায পড়িতে পড়িতে তোমার নামাযের অভ্যাস হইয়া যাইবে; অতঃপর তুমি নামায কখনও ত্যাগ করিবে না।” সে বলিলঃ “আচ্ছা, তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়াছ? তবে যাও, আমিও ওযূ ছাড়াই টুঁ মারিয়াছি এবং ফাঁকি দিয়াছি।”

মৌলবী ছাহেবের নিকটে থাকিতে হইলে রুটি খাওয়ার নিয়তে থাকিবে না; বরং রুটি নিজ নিজ ঘর হইতে খাইবে। তাহাতে মৌলবী ছাহেবের নিকটে থাকার কিছু কদর হইবে। সর্বসাধারণের হিতকর একখানি চটি কিতাব আমার হযরত পীর ছাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী আমি নিজে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল বিনামূল্যে বণ্টন করিয়া দিব। কিন্তু হযরত পীর ছাহেব বলিলেনঃ বিনামূল্যে নহে—মূল্য লইয়া দান কর। কেননা, বিনামূল্যের বস্তুর কোন কদর হয় না।

মোটকথা, খাঁটি নিয়তে সরল বিশ্বাসে এবং বাজে ঝামেলা হইতে মুক্ত থাকিয়া খোদার কাজ করা উচিত। তাহাতেই কিছু ফল পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে। মুযাফ্‌ফরনগর জিলার অন্তর্গত কীরানা নামক স্থানে জনৈক তহসীলদার এক ব্যক্তিকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলঃ "ইহার মনে ধর্মীয় ব্যাপারে জটিল জটিল সন্দেহ রহিয়াছে। হুযূর তাহাকে কিছু বুঝাইয়া দিলে মনে শান্তি পাইতে পারিত।" আমি বলিলামঃ সে আমার সঙ্গে চলুক এবং কিছুদিন আমার ওখানে থাকিলে তাহার সন্দেহ আপনা-আপনিই দূর হইয়া যাইবে। এই চল্লিশ দিনের উদ্দেশ্যেই আরেফ শীরাযী বলিয়াছেনঃ

شنیدم رهروے در سر زمینے ۔ همیں گفت ایں معما باقرینے

"শুনিতেছি—মা'রেফাতের পথের পথিক কোন স্থানে বসিয়া এই ধাঁধাটি এই ইঙ্গিত সহকারে বলিয়াছেন।"

সুতরাং অন্তত চল্লিশ দিনের জন্য তোমার অন্তরের বোতলে খোদার প্রেমের শরাব ভরিয়া লও। তোমার অন্তরে শান্তি আসিবে। বড় ওলীআল্লাহ্‌গণের খেদমতে থাকার সাহস না হইলে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমারই নিকটে থাকিয়া বিনামূল্যের ব্যবস্থাপত্র দ্বারা উপকার লাভ করিয়া দেখ। ফলকথা, কামেল লোকের সংসর্গের ফলেই এই শ্রেণীর সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যাইবে যে, "মৌলবীরা দুনিয়া উপার্জনে কি বাধা প্রদান করিতেছে?" প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাহারা দুনিয়ার অনুরক্ত হইতে নিষেধ করিতেছে। আলোচ্য আয়াতেও ইহার নিন্দাবাদ করা হইয়াছে এবং উক্ত আয়াত দ্বারা حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ হাদীসটির ব্যাখ্যাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়ার অনুরাগঃ মোটকথা, দুনিয়া উপার্জন করা এক কথা এবং দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হওয়া আর এক কথা। দুনিয়া উপার্জন করা জায়েয, কিন্তু দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হওয়া নাজায়েয। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন—প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পায়খানায় যাইয়া বসা, আর পায়খানাকে প্রিয় স্থান মনে করিয়া তথায় মন লাগাইয়া বসা। প্রথম অবস্থা জায়েয এবং দ্বিতীয় অবস্থা নাজায়েয। এইরূপ দুনিয়া উপার্জন করা জায়েয; কিন্তু দুনিয়াকে কাম্য এবং প্রিয় মনে করা হারাম। অনুরূপ শব্দেই কোরআন শরীফে ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে— كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ, "নগদ দুনিয়াকে তোমরা প্রিয় মনে করিতেছ আর আখেরাতকে ছাড়িয়া দিতেছ।"

এই আয়াতটি কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে মনে করিয়া কেহ কেহ এস্থলে প্রশ্ন করিতে পারে, যে আয়াত কাফেরদের উদ্দেশে নাযিল হইয়াছে, আমাদের সহিত উহার সম্পর্ক কি? এই-রূপে তরজমা-কোরআন দেখিয়া যখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ নহে, তখন তাহারা মনে করিতে পারে, অন্যত্র অবতীর্ণ আয়াতের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক? এই কারণে এস্থানে এসম্পর্কে কিছু বর্ণনা করা আবশ্যক। কাহারও সহিত আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যক্তিগত মহব্বত কিংবা শত্রুতা নাই; বরং বিশেষ বিশেষ আমলের ভিত্তিতেই কাহারও প্রতি তাঁহার মহব্বত কিংবা শত্রুতা হইয়া থাকে। যদিও কোন কোন নির্দেশ কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নাযিল হইয়া থাকে; কিন্তু শব্দের ব্যাপকতার কারণে নির্দেশটি ব্যাপক হইয়া যায়। সুতরাং কাফেরদের শানে অবতীর্ণ আয়াতগুলি যদিও অবতরণের ক্ষেত্র হিসাবে নির্দিষ্ট, কিন্তু শব্দের ব্যাপকতার কারণে সেইগুলির হুকুম সকল মানুষের জন্য ব্যাপক। কাজেই যে কাজের দরুন কাফেরদের

নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা আমাদের মধ্যেও পাওয়া গেলে উক্ত আয়াত হইতে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, তবুও যদি উক্ত আয়াতগুলিকে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্টও বলা হয়, তবে আমাদের জন্য আরও অধিক আফসোসের বিষয় যে, আমরা মুসলমান হইয়াও আমাদের মধ্যে কাফেরদের স্বভাব ও কার্যকলাপ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এমতাবস্থায় "কাফেরদের সম্বন্ধীয় আয়াতের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক?"—এরূপ সন্দেহের কোন কারণই থাকে না; বরং কাফেরদের সম্বন্ধীয় আয়াতগুলির ক্রিয়া আমাদের মধ্যে অধিক হওয়া উচিত। মোটকথা, সকলেই জানে যে, ব্যক্তিগত কারণে কাফেরদের নিন্দাবাদ, তিরস্কার এবং তাহাদের সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় না; বরং তাহাদের কুকর্মের জন্যই তাহাদিগকে তিরস্কার, নিন্দাবাদ এবং অভিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তোমরা যদি মুসলমান হও, তবে সেই আয়াতগুলিকে দেখিয়া—যাহা কাফেরদের ঘৃণ্য কাজের নিন্দাবাদ ও তিরস্কারের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে, অধিক উপদেশ লাভ কর এবং লক্ষ্য করিয়া দেখ, এক দিন যাহা কাফেরদের স্বভাব ছিল, তাহা আজ আমাদের মধ্যেও পাওয়া যাইতেছে। আফসোস! কি অন্যায় কথা!

দেখুন, যদি কোন ভদ্রলোককে চামার বলা হয়, তবে তাহার নিকট অত্যন্ত খারাপ বোধ হইবে। কিন্তু চামারকে চামার বলিলে তাহার মনে কোনই কষ্ট হইবে না। এইরূপে কাফেরকে কাফের বলিলে তাহার মনে যতটুকু ব্যথা লাগিবে, তাহার চেয়ে অধিক ব্যথা আমাদের লাগা উচিত। যেমন, হাদীসে বলা হইয়াছেঃ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ এই হাদীসেও মনে করা উচিত যে, এখানে كَفَرَ শব্দের শাব্দিক অর্থ (কাফের হইয়া গেল) গ্রহণ না করিয়া এর পরিবর্তে গৌণ অর্থ (কাফেরের ন্যায় কাজ করিল) গ্রহণ করিলে ইহার কঠোরতা লোপ পায় না; বরং ভীতি প্রদর্শন ও তিরস্কার আরও বৃদ্ধি পাইয়া যায়।

আরও একটি সন্দেহ হইতে পারে, আখেরাত ত্যাগ করার জন্য যে তিরস্কার করা হইয়াছে, সেখানে আখেরাতের বিশ্বাস ত্যাগ করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আখেরাতের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করা। আর আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা আখেরাতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সুতরাং শব্দই এখানে ব্যাপক নহে। কাজেই وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ বাক্যের উদ্দেশ্য আমরা নহি। ইহার উত্তর এই যে, প্রথমত, 'আখেরাত ত্যাগ করার অর্থ উহার বিশ্বাস ত্যাগ করা' বলা, প্রমাণহীন দাবী। দ্বিতীয়ত, যদি তাহা মানিয়া লওয়া যায়, তবে অন্যান্য আয়াতে স্পষ্টরূপেই ব্যাপকতা বুঝা যাইতেছে। তৃতীয়ত, শব্দগুলির ব্যাহ্যিক শব্দ তো অবশ্যই শর্তহীন। যে হৃদয়ে ব্যথা আছে, তাহা সামান্য শাব্দিক মিল থাকিলেও অস্থির হইয়া যায়। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ সন্দেহও তাহাকে প্রাণান্ত করিয়া তোলে। কবি বলেনঃ عشق است وهزار بدگمانی "অন্তরে এশ্‌ক থাকিলেই হাজার সন্দেহ উৎপন্ন হয়।" কিন্তু ইহার জন্য হৃদয়ে কামনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা আবশ্যক। যে হৃদয়ে এশ্‌ক্ নাই, তাহা কামনা ও আকাঙ্ক্ষা হইতে অনেক দূরে।

হযরত শিব্‌লী রাহেমাহুল্লাহর কিস্‌সা বিখ্যাত। কোন এক তরকারি বিক্রেতা তাঁহার সম্মুখ দিয়া ধ্বনি করিয়া যাইতেছিলঃ اَلْخِيَارُ الْعَشَرَةُ بِدَانِقٍ "এক সিকি দেরহামে দশটি কাক্‌ড়ী।" এই আওয়ায শ্রবণমাত্র তিনি خِيَارٌ শব্দের অর্থ কাক্‌ড়ীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ইহার অন্য অর্থ خَيْرٌ -এর বহুবচন خِيَارٌ অর্থাৎ, 'নেককার লোক' মনে করিলেন এবং ভাবিলেন, দশ জন নেক্‌কার লোকের মূল্য যখন সিকি দেরহাম, তখন আমার ন্যায় মন্দ লোকের মূল্য কি হইবে?

এই ভাবিয়া তিনি এক বিকট চীৎকার করিয়া বেহুশ হইয়া পড়িলেন। বস্তুত কোন বিষয়ের চিন্তা মনে প্রবল থাকিলে অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। জনৈক কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

بسکه در جـان فگـار وچشم بیدارم تـوئی ـ هرکه پیدا می شود از دور پندارم توئی

"আমার আহত প্রাণে এবং জাগ্রত চক্ষুতে তুমিই বিরাজমান, দূর হইতে যাহাকিছু আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকেই তুমি বলিয়া মনে করি।"

হাদীস শরীফে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জুমুআর দিন মসজিদে খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। আর কেহ কেহ ইতস্তত ঘুরাফেরা করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে বসিবার জন্য اِجْلِسُوْا "তোমরা বস" বলিয়া নির্দেশ দিলেন। জনৈক ছাহাবী ঐ সময় দরজা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিতেছিলেন। হুযূরের اِجْلِسُوْا শব্দটি শ্রবণমাত্র তিনি দরজায়ই বসিয়া পড়িলেন। যদিও এই আদেশ তাঁহার জন্য ছিল না। কিন্তু হুযূরের হুকুমের প্রতি আনুগত্য অধিক প্রবল থাকায় দরজায়ই বসিয়া পড়িলেন। হুযূরের আদেশ যাহার উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, শ্রবণমাত্র প্রতিপালিত না হওয়া পছন্দ করিলেন না।

মুসলমান! তোমাদের মধ্যে আনুগত্যের রুচিও নাই, মহব্বতও নাই। তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের কামনা এবং মহব্বত পরিলক্ষিত হইতেছে না। কামনা এবং মহব্বত থাকিলে কখনও তোমাদের মনে ইত্যাকার উদ্ভট প্রশ্ন ও সন্দেহের উদয় হইত না। বস্তুত আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু দুনিয়ার অনুরাগ এবং আখেরাতের প্রতি বিরাগের নিন্দা করাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। ইহাদের স্তর বিভিন্ন, দুনিয়ার প্রতি যেই স্তরের অনুরাগ থাকিবে, আখেরাতের প্রতি বিরাগও সেই পর্যায়েরই হইবে এবং ইহাদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তিরস্কারও তদ্রূপই হইবে। যদি দুনিয়া প্রিয় এবং আখেরাত বর্জনীয় বলিয়া আন্তরিক বিশ্বাসের পর্যায়ে হয়, তবে সে অনন্তকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করিবার উপযোগী হইবে। কেননা, এরূপ বিশ্বাস কুফরী। আর যদি আখেরাতের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস থাকে, কিন্তু তদনুযায়ী আমল না করে, তবে তাহা ফাসেকী এবং ইহার ফলে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করিবে। ফলকথা, বিশ্বাসের যেমন প্রয়োজন, তদ্রূপ আমলেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিশ্বাস নিখুঁত রাখিতে হইবে, বিশ্বাস দুরুস্ত থাকিলে আমলের প্রয়োজন নাই—এরূপ বিশ্বাস করা মারাত্মক। বিশ্বাস ও আমল নিজ নিজ স্তরে স্বতন্ত্র বিষয়। আমরা সুন্নী সম্প্রদায়; সুতরাং আমরা উভয় বস্তুকেই প্রয়োজনীয় মনে করি।

ছগীরা গুনাহের প্রতি বেপরোয়া হওয়ার কুফলঃ বিশ্বাস দুরুস্ত রাখিয়া আমল না করার শাস্তি যদিও কুফরীর স্তরে নহে, তথাপি এই স্তরও অবহেলার যোগ্য নহে। ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না; বরং ইহা ছগীরা গুনাহ্ হইলেও নিশ্চিন্ত হওয়ার বিষয় ছিল না। ভাবিয়া দেখুন, ক্ষুদ্র একটি অগ্নিকণা কি সর্বনাশ ডাকিয়া আনে! দুঃসাহসিকতার সহিত অবিরত ছগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকাও ভীষণ ক্ষতির কারণ। যিনি ছগীরা গুনাহ্কে বড় কিছু মনে করেন না, তিনি এখান হইতে যাইয়া ক্ষুদ্র একটি অগ্নি-কণা নিজের ঘরের চালে রাখিয়া দেখুন, অল্পক্ষণের মধ্যে কি কাণ্ড ঘটাইয়া দেয়। এইরূপে ছগীরা গুনাহ্ও সর্ববিধ নেক কাজকে বিনাশ করিয়া দিতে পারে, যদ্রূপ একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমস্ত ঘরকে জ্বালাইয়া ছাই করিতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের গুনাহ্ আখেরাত বর্জন। অর্থাৎ, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ঠিক রাখিয়া তদনুযায়ী আমল না করা, যদিও এই গুনাহের স্তর কুফরী হইতে নিম্নে, কিন্তু তদ্রূপ আমল করাও ভীষণ যুলম বা অন্যায়। বিশেষত কুফরী হইতে

নিম্নস্তরের হইলেই তাহা মূলত ছগীরা গুনাহ্ হওয়া অনিবার্য নহে। এই প্রসঙ্গে মাওলানার একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িয়াছেঃ

آسماں نسبت بعرش آمد فرود ـ لیك بس عالیست پیش خاك تود

“আরশের তুলনায় আসমান নিম্নে হইলেও যমীনের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে।”

অর্থাৎ, আরশ অপেক্ষা আসমান ক্ষুদ্র হইলেও যমীন অপেক্ষা অনেক বড়। কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর তুলনায় ছোট হইলে তাহা মূলত নিজে ক্ষুদ্র হওয়া অনিবার্য নহে। কেহ কেহ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস থাকার দাবী করিলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাস করে না ; বরং জাতীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ধর্ম যেহেতু এমন একটি বিষয়, যাহা জাতির সমস্ত সদস্যকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিতে পারে ; সুতরাং তাহারা সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের এই উদ্দেশ্য যদি অন্য কোন ধর্মের দ্বারা সফল হইবার আশা থাকিত, তবে কখনও তাহারা মুসলমান হইত না।

ধর্ম এবং উন্নতিঃ কোন এক খবরের কাগজে নিম্নের মন্তব্যটি পড়িয়া আফসোস হইলঃ “যেহেতু ইহা প্রগতির যুগ, কাজেই বর্বর যুগের কল্পনা ও চিন্তাধারা ত্যাগ করিয়া সকলেই এককেন্দ্রিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম অবলম্বন করা উচিত। তাহা এইরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্বে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ইহাকেই ধর্মের মূল বলিয়া নির্ধারণ করা হউক। রাসূলের রেসালতে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বাদ দিলেও চলিতে পারে।” দুঃখের বিষয়, মুসলমান হইয়া এইরূপ মন্তব্য ?

از مذهب من گبر ومسلمان گله دارد

“আমার ধর্মের বিরুদ্ধে মুসলমান এবং কাফের সকলেই অভিযোগ করে।”

এধরনেরই এক ব্যক্তির উক্তির উত্তরে আমি বলিয়াছিলামঃ “আল্লাহ্ তা'আলার একত্বে তো বিশ্বাস কর। আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁহার সত্তা এবং গুণাবলীতে একক সত্তা মনে করাই ‘তওহীদ’।” বস্তুত সত্য বলাই মানবীয় গুণাবলীর অন্যতম। মিথ্যা বলা খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তওহীদের বিপরীত হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অতএব, যে ব্যক্তি রেসালতে অবিশ্বাস করিবে সে আল্লাহ্‌র একত্বেও অবিশ্বাসী হইবে। সুতরাং তওহীদে বিশ্বাসের দাবী করিলে তাহার পক্ষে রেসালতে বিশ্বাস করাও অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর জাতি-পূজকরা রাসূলের রেসালতই খতম করিয়া ফেলিতেছে। এই শ্রেণীর লোকেরা কালক্রমে কদাচিৎ ইসলামের যৎকিঞ্চিৎ খেদমত করিলেও আমরা তাহাদের সেই খেদমতের কোনই মূল্য দিতে পারি না। কেননা, ধর্মের খেদমত করা তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে ; বরং শুধু সমাজ বা জাতির উন্নতিসাধনই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সত্য জ্ঞানে ইসলামের খেদমত করিলে তাহাদের কার্যকলাপেই তাহা প্রকাশ পাইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলী ইহার বিপরীত বোধ হইতেছে। তাহারা ইসলামী আকীদাসমূহের সমালোচনা করিতেছে। ধার্মিক লোকদিগকে তুচ্ছ ও হীন মনে করিতেছে এবং ইস্‌লামের বিধানসমূহে সন্দেহ সৃষ্টি করিতেছে। সত্য মনে ইস্‌লামের খেদমত করিলে এসবের সুযোগ কখনও আসিত না। তাহাদের উদ্দেশ্য জাতির গণ্ডি সম্প্রসারিত করা এবং জাতীয়তার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করা, যেমনিভাবে

অন্যান্য জাতি জাগ্রত হইয়াছে এবং উন্নতি লাভ করিয়াছে। মুসলমান সমাজ উন্নতিলাভের ক্ষেত্রে সকলের শেষে জাগ্রত হইয়াছে। বস্তুত এরূপ জাগ্রত হওয়ার চেয়ে নিদ্রিত থাকাই ভাল ছিল। মোটকথা, আখেরাত বর্জন করা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকাল কয়েক প্রকারের লোক দেখা যাইতেছে।

(১) প্রাচীনপন্থী আমীর লোক—ইহাদিগকে সাধারণ শ্রেণীর খারাপ কার্যে লিপ্ত দেখা যায়। যদিচ বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা তাহাদের কর্ম-জীবনকে নিতান্ত নিকৃষ্ট করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা আলেম-ফাযেল এবং নেককার লোক দেখিলে তাহাদের যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে এবং তাহাদের সম্মুখে অবনত থাকে। আর তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ওয়ালা হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্র ভাবিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এমন কি, শুধু দরবেশ বেশধারী লোক দেখিলেই, সে মূলে ডাকাতই হউক না কেন, অন্তরের সহিত ভয় করে এবং খেদমত করে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর দুনিয়াদারগণ তথাকথিত দরবেশদের চেয়ে সহস্র গুণে উত্তম।

আমার জনৈক বন্ধু বলিতেন ঃ অমুক জায়গার সমস্ত আমীর লোক বেহেশ্‌তী এবং সমস্ত ফকীর লোক দোযখী। কেননা, তথাকার ফকীরদের সহিত আমীরদের সম্পর্ক শুধু ধর্মের জন্য। পক্ষান্তরে ফকীর লোকেরা কেবল পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমীর লোকদের সহিত সংস্রব রাখিতেছে।

জনৈক পীরের কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে ঃ এক মুরীদ আসিয়া উক্ত পীরের নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করিল ঃ "হুযূর আমি দেখিলাম আমার অঙ্গুলি পায়খানায় পূর্ণ আর আপনার অঙ্গুলি মধুমাখা।" পীর ছাহেব তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন ঃ "ঠিকই তো দেখিয়াছ। ইহাতে সন্দেহ কি ? আমি এইরূপই এবং তুমি ঐরূপই।" মুরীদ বলিল, "আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত এখনও পূর্ণ হয় নাই। আমি ইহাও দেখিলাম যে, "আপনি আমার অঙ্গুলি চাটিতেছেন আর আমি আপনার অঙ্গুলি চাটিতেছি।" ইহা শুনিয়া পীর ছাহেব অতিশয় রাগান্বিত হইলেন। এই স্বপ্নের সারমর্ম এই যে, মুরীদ পীর হইতে ধর্ম শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহা মধুসদৃশ। আর পীর মুরীদ হইতে দুনিয়ার স্বার্থ লাভ করিতেছে, তাহা পায়খানাসদৃশ।

(২) আর এক প্রকারের লোক দেখা যায়, তাহাদের মনে ইস্‌লামের কোন গুরুত্ব বা মর্যাদাই নাই।

প্রথম প্রকারের লোকদের সংশোধনের উপায় অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করা। তাহাদের জ্ঞান-বিশ্বাস ঠিকই আছে, কেবল আমলে কমতি ছিল, তাই তাহাদেরকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। যেমন, হাদীসে আছে ঃ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'মৃত্যুকে খুব স্মরণ কর।' এই প্রকারের লোকেরা মৃত্যুর কল্পনা ও মুরাকাবা করিলে অতিসত্বর সংশোধন হইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন আরও রেওয়ায়ত আছে যে, দৈনিক বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করিলে শহীদের মর্যাদা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, কেবল মৃত্যুর নাম জপ কর ; বরং ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এমনভাবে মৃত্যুর স্মরণ কর, যাহা গুনাহ্‌ হইতে রক্ষা পাওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের সংশোধনের উপায় ঃ কোন তত্ত্বজ্ঞানী ও আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংসর্গে থাকা। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুসলমানদের প্রতি সদয় হও। তোমরা বড়ই বিপজ্জনক অবস্থায় রহিয়াছ। তোমাদের সংশোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এখন একটি কথা জানিয়া লউন—দুনিয়াদারগণ যেমন উপরোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত। তদ্রূপ দ্বীনদারগণও আখেরাত বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই ভাগে বিভক্ত। যাহেরওয়ালা এবং বাতেনওয়ালা।

ধর্মপরায়ণ লোকদের ত্রুটি ঃ দ্বীনদারদের মধ্যে একটি বাহ্যিক ত্রুটি এই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, তাহারা এমন কতকগুলি ধর্ম-কর্ম বর্জন করিয়া বসিয়াছে, যাহা বর্জন করা তাহারা ধর্মীয়

বিধানের বিপরীত মনে করে না। এইরূপে তাহারা পারলৌকিক ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, পরনিন্দা আজকাল ব্যাপক রোগে পরিণত হওয়ার কারণে ইহাকে পরহেযগারীর জন্য ক্ষতিকরই মনে করে না। বিবি তমীজা খাতুনের ওযূর মত। নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতম পাপানুষ্ঠানের পরেও তাহার ওযূ নষ্ট হইত না। এই রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে কোন কবি বলিয়াছেনঃ

قال را بگذار مرد حال شو ـ پیش مرد کاملے پا مال شو

"কথা ছাড়িয়া কাজে নিমগ্ন হও। কোন পীরে কামেলের পদতলে আশ্রয় লও।" অন্যথায় মানুষের অবস্থা প্রায়শ এইরূপ হয় যে,

واعظاں کیں خلوه بر محراب وممبر می کنند ـ چوں بخلوت می روند آں کار دیگر می کنند
مشکلے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس ـ توبه فرمایاں چرا خود توبه کمتر می کنند

"মসজিদের মেহ্‌রাবে মিম্বরের উপর বসিয়া যাঁহারা ওয়ায করিয়া থাকেন—লোকচক্ষুর অন্তরালে যাইয়া তাঁহারা অন্যরূপ কাজে লিপ্ত হন। মজলিসের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী ও বরেণ্য, তাঁহার কাজের কৈফিয়ত তলব করা কঠিন। দুঃখের বিষয়, যিনি স্বয়ং তওবার ধার ধারেন না, তিনি তওবা করিবার উপদেশ দিয়া বেড়ান।"

ইহা হইল ওয়ায-নছীহতকারীদের দোষ। যাহারা ওয়ায করেন না, তাহাদের মধ্যে ইহার চেয়ে অধিক মারাত্মক দোষ এই যে, অনেকে নিজে আমল করেন না বলিয়া ওয়াযও করেন না। ইহারা দ্বিবিধ দোষে দোষী। (১) নিজে আমল করেন না, আমলের জন্য চেষ্টাও করেন না। (২) অন্যান্য লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন না। কতক আলেম এরূপ আছে যে, ধনী লোকের দরবারে পড়িয়া থাকিয়া অর্থ-পিপাসু ও লোভী হইয়া যায়। ইহা অতিশয় নিন্দনীয়। সৎ ও নেক্‌কার লোক সর্বদা ধনী লোক অবজ্ঞা করিয়া চলেন। কথিত আছেঃ

بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ وَنِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ ○

"ধনী লোকদের দ্বারস্থ দরিদ্র লোক অতি নিন্দনীয় এবং দরিদ্র লোকের দ্বারস্থ ধনী লোক অতিশয় প্রশংসনীয়।"

যে সমস্ত আলেম ধনী লোকের মুখাপেক্ষী থাকেন, তাঁহারা কখনও হক কথা বলিতে সাহস পান না। কেননা, অর্থের লোভ তাহাদিগকে বোবা করিয়া রাখে। طمع بگسل وهرچه خواهی بگو "লালসা ছাড়িয়া দিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারিবে।"

শাহ সলীমের ঘটনা, বাদশাহ শাহ্‌জাহান তাঁহার নিকট আসিলে তিনি পা গুটাইলেন না। পরে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেনঃ "যখন হইতে হাত গুটাইয়াছি, পা প্রসারিত করিয়া দিয়াছি।"

মাওলানা ইস্‌মাঈল শহীদ (রঃ) একবার লক্ষ্ণৌ পদার্পণ করিলেন। লক্ষ্ণৌর জনৈক শাহ্‌যাদা তাঁহার দরবারে আসিয়া যমীনে মাথা রাখিয়া সালাম করিল। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইলেন। সে আশ্‌রাফী (স্বর্ণ-মুদ্রা) হাদিয়া পেশ করিল। তিনি মুখ ভেংচাইলেন। মাওলানা ইচ্ছাপূর্বকই এরূপ করিয়াছিলেন। দুনিয়াদারগণ আসিয়া যেন বিরক্ত না করে। অশালীন মনে করিয়া যেন কাছে না

ঘেঁষে। ফলে তিনি দুনিয়াদারদের ঝামেলা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই সমস্ত তিনি নির্লোভ থাকার কারণেই করিতে পারিয়াছিলেন।

সুতরাং অর্থ-লিপ্সার প্রতিকার এই শ্রেণীর আওলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শে থাকা। আল্লাহ্-ওয়ালাগণের সংসর্গে থাকিলে ধনের লিপ্সা দূরীভূত হইয়া যায় এবং অভ্যন্তরীণ অভাবশূন্যতা লাভ করা যায়। বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানকারীদের মধ্যে এই ত্রুটি বিদ্যমান। ইহা শুনিয়া বাতেনী ধর্মানুষ্ঠানকারিগণ মনে মনে খুশী হইবেন যে, "আমাদের মধ্যে কোন ত্রুটি নাই এবং কোন নিন্দনীয় কার্যও নাই।" কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ থাকা উচিত, সুস্বাদু খাদ্য পচিয়া গেলে তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সূফিগণের পথভ্রষ্টতাও ঠিক এইরূপই বটে। সূফীদের মধ্য হইতে কেহ পথভ্রষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে অসদাচরণ, কোপন স্বভাব প্রভৃতি বদভ্যাস দেখা দেয়। অথচ দরবেশগণের মধ্যে এসমস্ত নিকৃষ্ট স্বভাব বিদ্যমান থাকা অতিশয় নিন্দনীয় এবং ঘৃণেয়।

আমার পীর হযরত হাজী ছাহেব কেব্‌লার তা'লীম বলিতেছি। তিনি বলিতেন ঃ "কোন কোন দরবেশ লোক আমীর লোকদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, আমি ইহা পছন্দ করি না। কোন আমীর তোমার দ্বারে আসামাত্র— نِعْمَ الْأَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ 'ফকীরের দ্বারস্থ আমীর ব্যক্তি উত্তম লোক' বাক্য অনুযায়ী উত্তম আমীর বলিয়া গণ্য হইল। সুতরাং তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করা উচিত।" হযরত হাজী ছাহেব কেব্‌লা সকলের সঙ্গেই মিশিতেন এবং اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ "মানুষকে তাহাদের মর্যাদানুসারে সম্মান কর" বাক্যানুসারে সকলেরই যথোপযোগী সম্মান করিতেন। আমাদের প্রতিও নির্দেশ—মানুষের সহিত তাহাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ কর। আমার ধারণা, আল্লাহ্ যাহাকে আমীর বা বড় লোক বানাইয়াছেন, তোমরাও তাহাকে বড় মনে কর। অবশ্য তাহাদের খোশামোদ-তোষামোদ করিও না বা তাহাদের নিকট হইতে কোন কিছুর লোভ করিও না, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহারা সৎ-স্বভাবাপন্ন, তাহারা আমীর লোকদের সঙ্গে মিশেন না, তাহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করেন না; তবে তাঁহারা তাহাদের সংশোধন কেমন করিয়া করিবেন? আচ্ছা, আপনারা তাহাদের বাড়ীতে যাইবেন না। কিন্তু তাহারা আপনাদের দরবারে আসিতে ইচ্ছা করিলেও বাধা দিবেন না; বরং আসিলে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপত্তি করিবেন না। কেননা, তাহাদের সংশোধন করাও আপনাদের জন্য ফরয। কোন কোন আমীর লোক আলেম ও পীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকেন, "তাহারা আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের হেদায়ত এবং সংশোধন করেন না কেন?" আমার উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে আপনারা সেই অভিযোগের অসারতা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, পিপাসার্ত ব্যক্তিই কূপের নিকট যায়। কূপ কখনও পিপাসার্তের নিকট যায় না। আলেমগণ তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন, তোমরাই আলেমদের মুখাপেক্ষী; অতএব, তোমরাই তাঁহাদের নিকট যাও। কোন সিভিল সার্জন কোনদিন তোমাদের ডাকা ব্যতীত এবং ভিজিট গ্রহণ ব্যতীত তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে কি? সুতরাং আমার মতে মৌলবীরাও যদি হেদায়তের জন্য ফিস্ নির্ধারিত করিয়া দেয়, তবে তাহা সঙ্গতই হইবে। কিন্তু মৌলবী ছাহেবগণ তাড়াহুড়া করিবেন না। আমার মত প্রকাশ পাইতেই ফিস্ বসাইয়া দিবেন না; আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এখনও সময় আসে নাই। দুনিয়ার দরবেশগণের মধ্যে উপরিউক্ত এই কোপন স্বভাব দোষ রহিয়াছে; কাজেই তাঁহারাও নির্দোষ নহেন।

সূফিগণের ত্রুটি ঃ প্রকৃত সূফী লোকের মধ্যে আর এক প্রকারের দুনিয়া-প্রীতির দোষ রহিয়াছে, যাহা অতি সূক্ষ্ম। তাহারা সামান্য কাজ করিয়াই কোন অবস্থা বা হাল উৎপন্ন হওয়ার প্রতীক্ষায়

থাকেন। কোন হাল উৎপন্ন হইলে ইহাও দুনিয়া-প্রীতির ফল। কেননা, হাল উৎপন্ন হওয়া ইহলৌকিক ফল। আল্লাহ্ তা'আলা এই ফল প্রদানের ওয়াদাও করেন নাই। আখেরাতের ফলই প্রকৃত ওয়াদা এবং উদ্দেশ্য। তাহা হইল দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভ করা। ইহাও সূফীদের বড় ত্রুটি, ইহার প্রতি অনেকে লক্ষ্যই করে না, ইহার প্রতিকার বর্ণনা করিতেছি।

হযরত হাজী ছাহেব মরহুমের নিকট যদি কেহ আসিয়া বলিত, "হযরত! আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কোন ফায়দা পাইতেছি না।" তিনি উত্তর করিতেন ঃ "আল্লাহ্‌র নাম লইতে পারিতেছ, ইহা কি কম লাভ?"

گفت ان الله تولبيك ماست ـ ويں نياز ودر دل پيك ماست

হযরত হাজী ছাহেব ইহাও বলিয়াছেন ঃ যে আমীর লোক তোমাকে পছন্দ করে না, তুমি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলে কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দিবে। অতএব, তোমরা যখন মসজিদে যাইতেছ এবং তথা হইতে বহিষ্কৃত হও না, তখন ইহাতেই মনে করিও যে, তোমার হাযিরী কবূল হইয়াছে। দেখিতে পাইতেছ না, যাহাদের হাযিরী কবূল নহে, তাহাদের মসজিদে যাওয়ার তওফীকই দেওয়া হয় না।

একটি ঘটনা—কোন এক আমীর লোকের চাকর নামাযের সময় হইলে প্রভুর অনুমতি চাহিল। মনিব বলিলেন ঃ আচ্ছা, যাও। চাকর মসজিদে চলিয়া গেল আর মনিব ঘরের দরজায় বসিয়া রহিল। মসজিদ হইতে ফিরিতে চাকরের অনেক গৌণ হইয়া গেল। মনিব অগত্যা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ এতক্ষণ মস্‌জিদে কি করিতেছ? চাকর উত্তর করিল ঃ "বাহির হইতে দেন না।" মনিব বলিলেন ঃ "কে বাহির হইতে দেয় না?" সে উত্তর করিল ঃ "যিনি আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন না, তিনি।"

যেকের এবং কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ঃ এক ব্যক্তি কোন একজন তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল ঃ "এত দিন যাবত যেকের এবং এবাদত করিতেছি, আজ পর্যন্ত কোন ফল পাইলাম না।" উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ "ফল না পাইলেও কোন পরোয়া নাই।" ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর—প্রভু যদি কোন চাকরকে কোন কাজের আদেশ করেন, তখন চাকর যদি জিজ্ঞাসা করে, এই কাজের বিনিময় কি পাওয়া যাইবে? চাকরের এই উক্তি ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য হইবে না? এইরূপে আমরাও খোদার গোলাম। তাঁহার নিকট কোন বিনিময় চাওয়ার অধিকার আমাদের নাই।

'বোস্তাঁ' কিতাবে একটি কাহিনী লিখিত আছে। এক ব্যক্তি এবাদত করিত, কিন্তু গায়েবী আওয়ায আসিত—"কবূল হয় না।" তবুও সে যথারীতি এবাদতে মগ্নই থাকিত। তাহার, জনৈক মুরীদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ এমন এবাদতে ফল কি, যাহা কবূল হয় না। তিনি বলিলেন ঃ বৎস!

توانی از آں دل به پرداختن ـ که دانی که بے او تواں ساختن

"এই দ্বার ভিন্ন অপর কোন দ্বার থাকিলে আমি তথায় চলিয়া যাইতাম। দ্বার তো মাত্র এই একটিই। এখান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় যাইয়া ঠাঁই পাওয়া যাইবে?" তৎক্ষণাৎ আওয়ায আসিল ঃ

قبول است گرچه هنر نیست است ـ که جز ما پناه دیگر نیست است

“যদিও গুণ বলিয়া গণ্য নহে, তথাপি কবূল করা গেল। কেননা, আমার দ্বার ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল নাই।”

বাইআ'তের স্বরূপ ঃ কানপুর শহরে শাহ্ গোলাম রাসূল ‘রাসূলনোমা’ নামে একজন বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি তাওয়াজ্জুহ্ দ্বারা মুরীদকে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) যেয়ারত করাইয়া দিতেন। তিনি ভিন্ন আরও অনেক বুযুর্গ লোক ছিলেন, যাঁহারা হুযূরে আকরামের (দঃ) যেয়ারত করাইতেন। যাহাহউক, তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে নিজ পীরের দরবারে বাইআত হইতে গেলেন। পীর ছাহেব তাঁহাকে এস্তেখারা করিতে বলিলেন। শাহ্ ছাহেব তথা হইতে একটু দূরে সরিয়া বসিলেন এবং একটু পরেই আবার হাযির হইলেন। পীর ছাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “এস্তেখারা কেমন দেখিলে ?” তিনি বলিলেন ঃ “আমি বাইআত হওয়া সম্বন্ধে নফ্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলাম (‘বাইআত’ শব্দের অর্থ—বিক্রীত হওয়া)। তুমি বাইআত হইলে আযাদী হারাইয়া গোলামে পরিণত হইবে। বোকার মত কাজ করিতে যাইতেছ কেন ? নফ্‌স্ উত্তর করিল ঃ বিক্রীত হওয়ার পরে খোদা তো পাওয়া যাইবে ?” আমি বলিলাম ঃ “খোদা তোমার ইজারার সম্পত্তি নহে। যদি না পাইলে ?” নফ্‌স্ বলিল ঃ না পাওয়া গেলে পরোয়া কি ? তিনি তো এতটুকু জানিতে পারিলেন যে, কেহ আমার অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি ধরা দেই নাই।

همینم بس که داند ماهر ویم ـ که من نیز از خریداران اویم

“আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট— আমার প্রিয়জন জানিতে পারিল যে, আমিও তাঁহার অন্যতম খরিদ্দার।”

পীর ছাহেব বলিলেন ঃ “আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। এমন এস্তেখারা কেহ করে নাই।”

প্রত্যেক ব্যাপারে কাজই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ফল পাওয়া যাক্ বা না যাক্, সকল অবস্থাতেই রাজী থাকা উচিত।

এরূপ না হইলে সেই কাজ প্রকারান্তরে দুনিয়া-প্রীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে। তাই বলি, মুসলমান ! আখেরাতের জন্য আমল করুন। অন্যথায় আখেরাত বর্জন এবং দুনিয়া-প্রীতির দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

তারজীহুল্ আখেরাহ্

[আখেরাতের প্রাধান্য]

■

দুনিয়া উপভোগ করিতে শরীঅত নিষেধ করে নাই, কেবল দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রগণ্য করিতে বারণ করিয়াছে। অতএব, ব্যবসায়ের দ্বারাই হউক আর চাকুরী দ্বারাই হউক, প্রয়োজন পরিমাণে দুনিয়া উপার্জন করা হারাম নহে, তবে ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া দুনিয়া উপার্জন করা অবশ্যই হারাম।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ○ صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى ○

আল্লাহ্ তা'আলার অভিযোগ

তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলির মধ্যে প্রথম আয়াতটি সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করিব। পরবর্তী আয়াত দুইটিতে এই আয়াতেরই পোষকতা রহিয়াছে। সুতরাং আমিও পোষকতার জন্যই পাঠ করিয়াছি, অন্যথায় প্রথম আয়াত সম্বন্ধে বলাই আমার উদ্দেশ্য। কেননা, এই আয়াতটিই মুখ্য এবং পরবর্তী দুইটি ইহার আনুষঙ্গিক। কাজেই বর্ণনার বেলায়ও ইহাদিগকে মুখ্য এবং আনুষঙ্গিক-রূপেই গণ্য করা হইবে।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের একটি অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর উহা সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। এই অবস্থাটি যেমন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত—উহার একটি স্তর কাফেরদের সহিত সীমাবদ্ধ। আর একটি স্তর কাফের এবং মুমেনদের মধ্যে ব্যাপক—তেমনি এই অবস্থা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহাও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। বড় অবস্থা সম্বন্ধে অধিক

অভিযোগ এবং ছোট অবস্থা সম্বন্ধে কম অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু ছোট স্তরের অবস্থা মুমেন এবং কাফেরের মধ্যে ব্যাপক; সুতরাং এই অবস্থা সম্বন্ধীয় অভিযোগও উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপক।

এখন শুনুন, সেই অবস্থাটি কি এবং তৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি? আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا "বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দান করিতেছ।" এই বাক্যে (بل) বরং শব্দটি হইতে বুঝা যায়, পূর্বোক্ত উক্তি ত্যাগ করিয়া উহার বিপরীত অন্য একটি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে বলা হইয়াছিলঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى "যাহারা নিজের নফ্সের পবিত্রতা সাধন করিয়াছে এবং স্বীয় প্রভুর নাম যেকের করিয়া নামায পড়িয়াছে—তাহারাই সফলতা লাভ করিয়াছে।" অর্থাৎ সফলতালাভের উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "যাহারা কোরআন শরীফ শ্রবণপূর্বক কলুষিত আকীদা, স্বভাব ও অসঙ্গত কার্যাবলী হইতে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে এবং স্বীয় প্রভুর নাম যেকের করিতে ও নামায পড়িতে রহিয়াছে, তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। অতঃপর (بل) 'বরং' দ্বারা পূর্বকথা পরিত্যাগপূর্বক বলিতেছেনঃ "কিন্তু হে অবিশ্বাসিগণ! তোমরা কোরআন শ্রবণ করিয়া উহার নির্দেশ পালন কর না, তদনুযায়ী আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ কর না; বরং তোমরা ইহলৌকিক জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতেছ। সারকথা, সফলতালাভের বিপরীত আমাদের এই অবস্থা। অবশ্য ইহাকে পরিষ্কারভাবে বিপরীত অবস্থা বলা হয় নাই। কিন্তু (بل) অর্থাৎ, 'বরং' শব্দে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ববর্তী কথা বিলোপ করিয়া অন্য একটি কথা সাব্যস্ত করা হইয়াছে। বস্তুত বিলোপ করা ও সাব্যস্ত করার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই বুঝা যাইতেছে, এই অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার বিপরীত। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারিলেন, পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া সফলতালাভের বিপরীত এবং ইহার ফলে সফলতা বিফলতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং আমাদের সেই অবস্থাটি এই যে, আমরা নিজেদের সফলতালাভের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেছি না। পরন্তু খোদা তা'আলা আমাদের এই অবস্থারই অভিযোগ করিয়া বলিতেছেনঃ "তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেছ।"

সুতরাং এই বিষয়টি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এস্থলে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সাধারণ অভিযোগ নহে; বরং ইহার পরিণাম সফলতা লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিফলতা ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাই তো আমাদের চৈতন্য উদয়ের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত এবং আমাদের মনে এই ভয় আসা উচিত যে, সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অবস্থারই অভিযোগ করিতেছেন। ইহা কি কম কথা? আহ্কামুল হাকেমীন' কাহারও অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। সাধারণ হাকিমের অভিযোগেই লোকের দুর্দশার সীমা থাকে না। তদুপরি আল্লাহ্র অভিযোগের কথা শুনিয়া মুসলমান মাত্রেরই সতর্ক হওয়া উচিত। বিশেষত যখন এমন বিষয়ে অভিযোগ করা হইতেছে—যাহার পরিণাম আমাদের জন্যই ক্ষতিকর। আল্লাহ্ পাকের তাহাতে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এই আয়াতটিতে যদিও কাফেরদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমরা নিশ্চিন্ত ও দুঃসাহসী হইতে পারি না। কেননা, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিভিন্ন স্তর আছে। অবশ্য উহার প্রধানতম স্তর কাফেরদের মধ্যেই রহিয়াছে। এই কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও সর্বাপেক্ষা বড়। আর আমাদের মধ্যে তাহা ক্ষুদ্র স্তরের বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে

অভিযোগও ছোট; কিন্তু অভিযোগ অবশ্যই আছে। কেননা, কারণ যখন বিদ্যমান তখন অভিযোগ নিশ্চয়ই হইবে। অতএব, এই আয়াতটিতে কাফেরদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে ভাবিয়া আমাদের নির্ভীক হওয়া উচিত নহে এবং মনে করা উচিত নহে যে, উক্ত দোষে কাফেরেরা যত গাফেল আমরা তত গাফেল নহি। কেননা, কাফেরদের তুলনায় সামান্য হইলেও যখন আখেরাত হইতে অসতর্কতা আমাদের মধ্যে কিছু রহিয়াছে, তখন আমরা কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

ক্ষতিকর বিষয়ের বিভিন্ন স্তর ঃ পার্থিব ব্যাপারে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ক্ষতিকর বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে, তাহাতে কেহ সর্বপ্রধান স্তর ত্যাগ করিয়া অপর কোন প্রধান স্তর অবলম্বন করে এমনটা দেখা যায় না। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের রুচির কথা ছাড়িয়াই দিন। তাঁহারা তো লাভ-ক্ষতির কথা ছাড়িয়া খোদার অসন্তোষকেই পর্বত-পরিমাণ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু পেটপূজকেরা হয়ত সর্বনিম্ন স্তরের ক্ষতিকর বিষয়কে কিছুটা সহজ ও সম্ভব মনে করে। তাই বলিয়া ইহারাও প্রধানতমকে ছাড়িয়া প্রধানকে অবলম্বন করেনা। সর্বনিম্নস্তরের ক্ষতিকর বিষয়কে যে ইহারা সহজ মনে করে তাহা কেবল ধর্মীয় ব্যাপারেই। অন্যথায় পার্থিব ব্যাপারে তো তাহারা সর্বনিম্ন স্তরের ক্ষতিকর বিষয় হইতেও তেমনি সাবধানতা অবলম্বন করে, যেমন বড় রকমের ক্ষতিকর বিষয় হইতে সাবধান থাকে।

দেখুন, আপনাদের কাহারও ঘরের চালে একটি বড় জ্বলন্ত কয়লা পড়িতে দেখিলে যতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকণা পড়িতে দেখিলেও ততটুকুই ভীত এবং সাবধান হইবেন।

এইরূপে কেরোসিনের পূর্ণ টিনের মধ্যে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ফেলিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকেন না। অথচ ইহাতে ম্যাচের কাঠি পড়িয়া কোন কোন সময় নিভিয়াও যায়। তথাপি তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কেননা, আগুনে পুড়িয়া যত লোক মরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা বিরাট অগ্নিকুণ্ড কিংবা কোন বয়লারের আগুনে পুড়িয়া মরে নাই; বরং ইহাদের অধিকাংশকে ক্ষুদ্র একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠিই ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং জ্ঞানীরা বিরাট অগ্নিকুণ্ড কিংবা ইঞ্জিনের আগুনকে যেরূপ ভয় করে, ক্ষুদ্র একটি অগ্নিকণাকেও সেরূপই ভয় করিয়া থাকে; বরং ক্ষুদ্র অগ্নিকণা হইতে সতর্ক থাকার প্রতি বেশী জোর প্রদান করে। কেননা, নির্বোধেরা ইহাকে তুচ্ছ মনে করিয়া ইহা হইতে কম সতর্ক থাকে। সুতরাং আপনি কখনও কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে কাহাকেও তন্দুর কিংবা ইঞ্জিনের আগুন হইতে আত্মরক্ষার তালীম দিতে দেখেন নাই। কারণ, ইহা হইতে সকলেই সতর্ক থাকে। অবশ্য অনেকবারই চেরাগ কিংবা অগ্নিকণা হইতে সতর্ক থাকার তালীম দিতে নিজেদের মুরুব্বীয়ানকে দেখিয়াছেন।

অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, নিম্নস্তরের ক্ষতিকর বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করাই অধিক সঙ্গত। এই কারণেই হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদিগকে বেগানা পুরুষের সঙ্গে নির্জনে দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহার ভাষা তত কঠিন নহে, যত কঠিন ভাষায় ঐ সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত নির্জনে দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয আছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্ত্রীলোক যদি তাহার দেবরের সহিত নির্জনে উঠা-বসা করে তাহা কেমন ? হুযূর উত্তরে বলিলেন ঃ اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ "দেবরের সঙ্গে নির্জন মিলন সাক্ষাৎ মৃত্যু।" এই পার্থক্যের কারণ এই যে, আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হওয়াকে মানুষ হাল্‌কা মনে করিয়া থাকে এবং হাল্‌কা মনে করার কারণে

সতর্কতা অবলম্বন করে না। বস্তুত তরবিয়তের নীতি এই যে, সাধারণ লোক যে ক্ষতিকর বিষয়কে হাল্কা মনে করে—মুরুব্বী ও জ্ঞানী লোকেরা তাহাদিগকে সেই বিষয় হইতেই অধিক ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

কাজেই নফসের এই আপত্তি ভুল প্রমাণিত হইল যে, উক্ত আয়াতের লক্ষ্যস্থল কাফের সম্প্রদায়। কেননা, এখন পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রগণ্য মনে করা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রধান স্তর কাফেরদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বারণ করা হইয়াছে, আর তোমাদের মধ্যে উহার ছোট স্তর রহিয়াছে—তোমাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে। অভিযোগের মূল উৎস ও কারণের মধ্যে চিন্তা করা উচিত। যদি সেই কারণ বিদ্যমান থাকে, তবে অভিযোগও তোমাদের উদ্দেশে অবশ্যই হইবে। তবে যেই স্তরের কারণকে তোমরা নগণ্য মনে করিতেছ, তাহা প্রধান স্তরের তুলনায় অবশ্য ছোট হইতে পারে, কিন্তু মূলে তাহা ছোট নহে।

آسمـاں نسبـت بعرش آمد فرود ـ ليك بس عالى ست پيش خاك تود

“আসমান আরশের তুলনায় অবশ্যই ছোট, কিন্তু মূলে ছোট নহে। যমীনের তুলনায় সহস্র গুণ বড়।”

অসতর্কতার স্তর ঃ এইরূপে আমাদের মধ্যে যেই স্তরের অসতর্কতা রহিয়াছে, তাহা কাফেরদের অসতর্কতার তুলনায় কম, কিন্তু মূলে আমাদের অসতর্কতাও বড়, যাহা আমাদের ধর্মকে ত্রুটিপূর্ণ এবং মৃত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এসম্বন্ধে সমস্ত আযাবের ধমক যদিও কাফেরদিগকে সম্বোধন করিয়াই প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু কারণের মধ্যে আমরাও শরীক আছি বলিয়া যেই যেই স্থানে উক্ত কারণ পাওয়া যাইবে, কাফের মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই উক্ত সম্বোধনে অল্প-বিস্তর শরীক থাকিবে। যদি উক্ত সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল মুসলমানদিগকে মোটেই করা না হয়, তবে তো আরও অধিক লক্ষ্য করার বিষয়। কেননা, এমতাবস্থায় অর্থ এই হইবে যে, মুসলমানের দ্বারা এমন কাজ সংঘটিতই হইতে পারে না, তাহাদের ইস্লামই ইহা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করার জন্য যথেষ্ট। স্বতন্ত্ররূপে তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক সাবধান করার প্রয়োজন নাই। আর মুসলমানের দ্বারা তাহা সংঘটিত হইতে না পারার অর্থ এই নহে যে, বিবেকানুযায়ী মুসলমানের দ্বারা তাহা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ; বরং এতটুকু বলা যায় যে, সাধারণত মুসলমানের দ্বারা এরূপ কাজ হয় না। শরীঅতে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে, যে সমস্ত কাজ যাহাদের দ্বারা সাধারণত সংঘটিত হয় না, ঐসমস্ত কাজের জন্য তাহাদিগকে প্রকাশ্যে নিষেধ করা হয় না। কেননা, এ সমস্ত কাজ হইতে তাহারা নিজেরাই নিবৃত্ত থাকিবে।

দেখুন, শরীঅতে যেনা এবং চৌর্যবৃত্তি নিষেধ করা হইয়াছে। শরাব পান করার প্রতি নানাবিধ শাস্তির ধমক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্রাব পান করিতে এবং মল ভক্ষণ করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয় নাই। কেননা, স্বভাবত মুসলমান ; বরং কোন সুস্থ বিবেকবান লোক দ্বারা এই কাজ সম্ভবই নহে। তাহার ইস্লাম এবং সুস্থ ইন্দ্রিয় অনুভূতিই ইহা হইতে নিবৃত্ত রাখার জন্য যথেষ্ট। স্বতন্ত্ররূপে সম্বোধনপূর্বক নিষেধ করার কি প্রয়োজন? আর اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ আয়াতে নামায মন্দ কথা ও কাজ হইতে নিষেধ করার অর্থ এই স্বভাবত নিবৃত্ত রাখা।

নামাযের দ্বারা মন্দ কাজের দ্বার বন্ধ হওয়া ঃ ইহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, “নামায মন্দ এবং অশ্লীল কার্য ও কথা হইতে কিরূপে নিবৃত্ত করে? আমরা তো দেখিতে পাই, অনেক

নামাযী মন্দ কাজে লিপ্ত রহিয়াছে।” এসমস্ত লোকের বুঝা উচিত, নামায অনুভবনীয়রূপে মন্দ কার্য হইতে নিষেধ করে না বা বাধা প্রদান করে না; বরং নামাযের অবস্থাই এইরূপ যে, স্বভাবত মন্দ কথা ও কার্য হইতে নিবৃত্ত রাখে। যেমন বলা হয়, আইন ডাকাতি হইতে নিবৃত্ত রাখে। ইহার অর্থ এরূপ কেহ বুঝে না যে, আইন ডাকাতি হইতেই দেয় না; বরং অর্থ এই যে, ডাকাতি আইনত নিষিদ্ধ এবং তজ্জন্য আইনে কঠোর শাস্তির বিধান রহিয়াছে। কেহ যদি ইহার পরেও আইন অমান্য করিয়া ডাকাতি করিতে থাকে, তবে ইহাতে “আইন ডাকাতি হইতে নিবৃত্ত রাখে” কথাটি ভুল হইতে পারে না।

এইরূপে আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করা হয় নাই বলিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এইরূপ কার্য মুসলমানদের দ্বারা হওয়াই সম্ভব নহে। সুতরাং মুসলমানদিগকে পৃথকভাবে নিষেধ করা হয় নাই। কাজেই এই উপায়ে এই কার্যটির নিকৃষ্টতা আরও অধিক দৃঢ়রূপে ব্যক্ত হইয়া গেল। কেননা, এখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া কেবল কাফেরদেরই কাজ। মুসলমানদিগকে তাহাদের ইসলামই উহা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া থাকে। কাজেই এসম্বন্ধে মুসলমানদিগকে উদ্দেশই করা হয় নাই। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, যেই মুসলমান দুনিয়াকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, সে কাফেরদের কাজ করে এবং হুযূর (দঃ)-এর বাণীঃ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا। فَقَدْ كَفَرَ “যেই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে সে কাফের হয়”—এর অর্থ ইহাই। অর্থাৎ, সে কাফেরের ন্যায় কাজ করিয়াছে। কেননা, মুসলমানের পক্ষে নামায ত্যাগ করা সম্ভবই নহে। বস্তুত হুযূর (দঃ)-এর যুগে ব্যাপার এইরূপই ছিল। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিতেনঃ كَانَ فَرْقٌ مَّابَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ تَرْكُ الصَّلٰوةِ “আমাদের ও মুনাফেকদের মধ্যে প্রভেদ ছিল নামায ত্যাগ করা।” সুতরাং এই “কাফের হইয়া যায়” কথাটি ঠিক সেইরূপ—যেমন আমরা আমাদের ছেলেপিলেকে বলিয়া থাকি, “তুই একেবারে চামার”, অর্থ তুই চামারের ন্যায় কাজ করিয়াছিস। বাক্যটির এইরূপ অর্থ হয় না যে, তুই বাস্তবিকই চামার। হাদীসটির মর্মও এইরূপই বুঝিতে হইবে। ফলকথা, মুসলমানদিগকে এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল না বলিলে মুসলমানদের প্রতি তিরস্কার আরও কঠোর হইবে। সুতরাং কেহ আর এরূপ টালবাহানা করিতে পারেন না যে, আমরা এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল নহি। ইহা তো কাফেরদের উদ্দেশে বলা হইয়াছে। বন্ধুগণ! তবে তো আরও আফসোসের কথা—কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার যেই অভিযোগ ছিল, আপনারা তাহাতেই লিপ্ত হইতেছেন।

দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ফলঃ এখন বুঝিয়া লউন, আমাদের সেই অবস্থাটি কি? আল্লাহ্ তা'আলা যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। তাহা এই যে, আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করিতেছি। ইহা আমাদের মধ্যে এমন একটি রোগ, যাহাকে আমরা রোগ বলিয়াই মনে করি না, প্রায় সকলেই এই রোগে আক্রান্ত। আমরা চুরি, ব্যভিচার, মদ খাওয়া ইত্যাদিকে পাপের তালিকার মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। সুদ খাওয়া এবং ঘুষ লওয়াকেও পাপ মনে করি; কিন্তু কোন সময় কাহারও মনে এই কল্পনাও কি উদয় হইয়াছে যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়াও পাপ? এইদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। ইহাকে পাপ কি মনে করিবে; বরং কোন কোন সময় এরূপ উক্তি শুনা যায়ঃ “আমরা তো দুনিয়াদার মানুষ, আমরা দুনিয়া ত্যাগ করিতে পারি না। ইহা তো তাঁহারা পারেন যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র নাই, দুনিয়ার সহিত যাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।”

অতএব, দেখা যায়, দুনিয়াকে অগ্রগণ্য মনে করার কোন কোন স্তরকে তো ইহারা পাপই মনে করে না। আবার যেই স্তরকে পাপ মনে করে, তাহাতেও নিজদিগকে পাপী মনে করে না। কেননা, তাহারা যখন নিজদিগকে অপারক সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, তখন আর পাপ কোথায় রহিল? তাহারা হয়তো কোথাও শুনিয়া থাকিবে, অপারকতা ও বাধ্য-বাধকতার সময় পাপ থাকে না। যেমন, কেহ কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করিল, শরাব খাও, অন্যথায় মারিয়া ফেলিব। এমন কি, ভয় প্রদর্শনকারী এইরূপ করিতেও পারে। এই ক্ষেত্রে প্রাণরক্ষার জন্য এরূপ ব্যক্তি শরীঅত অনুযায়ী শরাব পান করিতে পারে। এমতাবস্থায় শরাব পান করিলে পাপ হইবে না। এই মাসআলা শুনিয়া মানুষ ইহাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যাপারে নিজকে অপারক মনে করিয়া পাপ কার্যে বেশ সাহসী হইয়া পড়িয়াছে।

আমি বলি, শরীঅতের এই আইনটির এইরূপ মনগড়া ব্যাখ্যা আপনি নিজেই তো করিয়াছেন। আপনার ইহাতে কি অধিকার আছে? অপারক হওয়ার সীমা আপনার শরীঅতের নিকটই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। বলপ্রয়োগে বাধ্য করার ক্ষেত্রে ফেকাহ্শাস্ত্রবিদগণ উহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, বলপ্রয়োগে বাধ্য করার কোন্ স্তর অপারকতার আওতায় আসে এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন, আপনি অক্ষমতার যেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সীমান্তের এক গ্রাম্য লোকের রেলওয়ে আইনের ব্যাখ্যা করার মতই হইয়াছে।

সে রেলগাড়ী হইতে একমণ ওযনের কিশমিশের পেটি বগলের নীচে চাপিয়া নামিয়া পড়িল। প্লাটফরমের দরজায় পৌঁছিলে টিকেট মাষ্টার তাহার নিকট টিকেট চাহিলে নিজের টিকেট দেখাইল। টিকেট মাষ্টার বলিল: এই মালের বিলও দেখাও। সে পুনরায় সেই একই টিকেট দেখাইল। মাষ্টার বলিল: ইহা তো তোমার টিকেট, মালের টিকেট কোথায়? সীমান্তের লোকটি বলিল: ইহা আমারও টিকেট, মালেরও টিকেট। মাষ্টার বলিল: না, তোমার এই মাল পনের সেরের বেশী ওযন হইবে। ইহার জন্য পৃথক টিকেট আবশ্যক। তখন সীমান্তের লোকটি বলিল: রেলওয়ে কোম্পানী পনের সেরের আইন এই জন্য করিয়াছে যে, ভারতবাসীরা পনের সেরের অধিক ওযনের মাল-সামান নিজে বহন করিয়া নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই আইনের অর্থ এই যে, যাত্রীরা নিজে যেই পরিমাণ মাল বহন করিয়া নিতে পারিবে উহার মাসুল লাগিবে না। ইহার অতিরিক্ত যেই মাল বহন করিতে কুলির প্রয়োজন হয়, সেই মালের ভাড়া দিতে হইবে। ভারতবাসীরা যেহেতু পনের সেরের অধিক মাল বহন করিয়া নিতে পারে না; তাই তাহাদের জন্য পনের সের বিনাভাড়ায় নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এক মণেরও অধিক মাল নিজে বহন করিয়া নিতে পারি। অতএব, ইহাই আমাদের পনের সের। ইহার ভাড়া লাগিতে পারে না।

বলুন তো, রেল কোম্পানী সীমান্তবাসী লোকটির এই ব্যাখ্যা মানিয়া নিতে পারে কি? কখনও না। কোম্পানী নিশ্চয়ই ইহার উত্তরে বলিবে—আইনের ব্যাখ্যা করার কোন অধিকার তোমার নাই। আইনের অর্থ তুমি আমাদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া উচিত।

এইরূপে শরীঅত বিধানের ব্যাখ্যা করারও আপনাদের কোন অধিকার নাই। আপনারা আপনাদের কৃত ব্যাখ্যানুযায়ী মাযুর বলিয়াও গণ্য হইতে পারেন না। মোটকথা, মানুষ নিজে নিজে এইরূপ ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতে বাধ্য। সুতরাং আমরা ইহাকে পাপ বলিয়া মনে করি না। পাপ মনে করিলেও অতি নিম্ন স্তরের। বস্তুত কবীরা গুনাহ্কে ছগীরা মনে করাই স্বয়ং জঘন্য পাপ।

যেমন, কেহ ডাকাতিকে গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করার উপর ধারণা করিয়া মনে করে, গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করাও পরের দ্রব্য বিনষ্ট করা এবং ডাকাতির মধ্যেও তাই। সুতরাং এই দুইটিই এক পর্যায়ের পাপ। এইরূপ ব্যক্তিকে যুগের শাসক অবশ্যই আইনের অধিকারে হস্তক্ষেপের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিবেন এবং বলিবেন ঃ আইনত যখন ডাকাতি এবং গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করার শাস্তি পৃথক অর্থাৎ, ডাকাতির অপরাধে দ্বীপান্তর কিংবা কমপক্ষে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করার শাস্তি এত গুরুতর নহে, তবে উভয় অপরাধ সমান করিয়া দেওয়ার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি আইনের উপর অনধিকারচর্চা করিতেছ।

এইরূপে শরীঅতে যখন প্রত্যেক পাপের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে, তখন সমস্ত পাপ কার্যকে সমান মনে করার অধিকার কাহারও নাই। যদি কেহ কবীরা গুনাহ্‌কে ছগীরা মনে করে, তবে সে শরীঅতের বিধান পরিবর্তন করার দরুন অতিরিক্ত আরও এক পাপে পাপী হইবে। এই কারণে ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, পাপ কার্যকে লঘু মনে করাও পাপজনক ; বরং কুফরীর নিকটবর্তী।

আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকার কুফল ঃ আল্লাহ্ পাক অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন ঃ তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার রোগে আক্রান্ত রহিয়াছ।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (على الاٰخرة) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

“বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেছ। অথচ আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অধিক স্থায়ী।” অর্থাৎ, দুনিয়ার সুখ-শান্তি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার চেষ্টায়ই তোমরা ব্যস্ত। আখেরাতের কাজ যাহাই নষ্ট হউক তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। এখানে আখেরাত সম্বন্ধে একটি শব্দ বলা হইয়াছে خير ইহা আধিক্যবোধক শব্দ। অর্থ এই যে, আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। আরও একটি শব্দ বলা হইয়াছে ابقى ইহাও আধিক্যবোধক শব্দ। অর্থাৎ, আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে বহুগুণে অধিক স্থায়ী। কিন্তু তথাপি তোমরা দুনিয়াকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছ। আখেরাতের জন্য কোন চিন্তাই নাই। অথচ ইহাও দেখা গিয়াছে যে, আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়া আরও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। আমি একটু পরেই বর্ণনা করিতেছি, আখেরাত মূলত গুরুত্ব প্রদানের যোগ্য তো বটেই, তদুপরি এই কারণেও গুরুত্ব প্রদান-উপযোগী যে, আখেরাতের চিন্তা মনে স্থান পাইলেই দুনিয়ার স্বাদও তখনই ভাগ্যে জোটে। পক্ষান্তরে যাহারা আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; খোদার শপথ! তাহারা দুনিয়ার স্বাদও পায় না।

এখন বুঝা উচিত, আল্লাহ্ তা'আলার এই অভিযোগের লক্ষ্যস্থল আমরাও কিনা? কাফেরদের উদ্দেশে অভিযোগ তো প্রকাশ্যে বুঝা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানগণও আজকাল এই অভিযোগের পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় প্রত্যেকেই এই রোগে আক্রান্ত। প্রত্যেকেই আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেছে। আমি বলি না যে, মুসলমানদের আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস নাই কিংবা বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছে। কোন মুসলমান এইরূপ নাই, আখেরাতের প্রতি যাহার বিশ্বাস নাই কিংবা সে আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে কম মনে করিতেছে। অবশ্য কাফেরদের বিশ্বাস এইরূপ হইতে পারে। কেননা, কোন কোন কাফের তো আখেরাতের অস্তিত্বই অবিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের

ধারণা—মৃত্যুর পরে মানুষ মাটির সহিত মিশিয়া যায়, কুত্রাপি তাহাদের শাস্তিও হইবে না, সওয়াবও প্রাপ্ত হইবে না। আবার কোন কোন কাফের আখেরাত বিশ্বাস করে, কিন্তু তাহা এইরূপ—যেমন কেহ বলে, আমি রাজাকে দেখিয়াছি, তাহার একটি লেজ ও একটি শুঁড় আছে। প্রত্যেকে বুঝিবেন যে, এইরূপ ব্যক্তি রাজাকে কখনও দেখে নাই।

এইরূপে যে সমস্ত কাফের আখেরাত বিশ্বাস করে, তাহারা আখেরাত সম্বন্ধে এমন সব মনগড়া আজগুবি কথা বলিয়া থাকে যে, তাহাতে সহজেই বুঝা যায়, তাহারা আখেরাত মোটেই বিশ্বাস করে না; অন্য কিছু বিশ্বাস করে। সুতরাং তাহাদের এই বিশ্বাস অবিশ্বাসেরই শামিল। এই কারণে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা দুনিয়া অর্জনেই নিয়োজিত হয়। আখেরাতের একটুও চিন্তা নাই।

অবশ্য মুসলমানদের অবস্থা এইরূপ নহে। তাহারা আখেরাত বিশ্বাসও করে এবং আখেরাত সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানও সঠিক। আখেরাতকে তাহারা দুনিয়ার চেয়ে উত্তমও মনে করিয়া থাকে। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিব, তাহাদের কার্য বিশ্বাসের অনুরূপ নহে। তাহারা শুধু আখেরাত সম্বন্ধীয় বিশ্বাসকেই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিতেছে। কার্যক্ষেত্রে তদ্দ্বারা কাজ লয় না। যদিও বিশ্বাসেরও প্রয়োজন আছে এবং মূলত তাহাও উদ্দেশ্য; কিন্তু বিশ্বাসের একটি উদ্দেশ্যগত আমলও আছে। শরীঅত যে সমস্ত বিশ্বাস্য বিষয়ের তা'লীম দিয়াছে, তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। (১) মূলত সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং (২) উক্ত বিশ্বাসের দ্বারা কার্যক্ষেত্রে কাজ লওয়া। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, কাজের মধ্যে বিশ্বাসের যথেষ্ট দখল রহিয়াছে। জনৈক আল্লাহ্ওয়ালা বলেনঃ

موحـد چه بر پـائے ریزی زرش ـ چه فولاد هنـدی نهی بر سرش
امیـد وهـراسش نبـاشد ز کس ـ همین است بنیـاد توحید وبس

"একত্ববাদীর পদতলে যদি ভূরি ভূরি ধন-রত্ন রাখিয়া দাও কিংবা ইস্পাতের তীক্ষ্ণধার তরবারি তাহার মাথার উপর উত্তোলন কর, কোন কিছুরই লোভ বা ভয় তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। ইহাই তওহীদ বা একত্ববাদের ভিত্তি।"

পূর্ণাঙ্গ তওহীদের ক্রিয়াঃ দেখুন, উপরিউক্ত কবিতায় কবি তওহীদকে আমলের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলিয়াছেন। তওহীদ যখন পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন উহার ফল এই হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রত্যাশা বা ভয় থাকে না। কোরআনেও এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছেঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

"যেই ব্যক্তি খোদাকে পাইবার এবং তাঁহার দর্শনলাভের আশা করে অর্থাৎ, বিশ্বাস রাখে, তাহার নেক আমল করা উচিত এবং সে যেন নিজ প্রভুর এবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।" এই لَايُشْرِكْ শব্দের তফ্সীরে হাদীস শরীফে আসিয়াছেঃ لَايُرَائِىْ অর্থাৎ, সে যেন 'রিয়াকারী' না করে। হুযূরের এই তফসীরকে আল্লাহ্র তফসীর মনে করিতে হইবে। কেননা—

گـفتهٔ او گـفتهٔ الله بود ـ گرچه از حلقوم عبد الله بود

"তাঁহার উক্তি আল্লাহ্রই উক্তি। যদিও তাহা আল্লাহ্র বান্দার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।"

এই আয়াতটি হইতে দুইটি কথা জানা গিয়াছে। (১) আল্লাহ্ তা'আলার দর্শনলাভের বিশ্বাস আমলের মধ্যে বিশেষ ক্রিয়াশীল। কেননা, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দর্শনলাভে বিশ্বাসী,

তাহাকে তিনি নেক আমল করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। দর্শনলাভের বিশ্বাসকে শর্ত এবং নেক আমল করাকে উহার জাযা বা ফল বলা হইয়াছে। বস্তুত শর্ত ফলের কারণস্বরূপ। কাজেই দর্শনলাভের বিশ্বাসই মানুষের নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ। (২) দ্বিতীয়ত, ইহাও জানা গেল যে, খোদার দর্শনলাভের বিশ্বাসের কারণে "রিয়াকারী" অর্থাৎ, লোক দেখান মনোভাব দূরীভূত হয়। কেননা, আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করিতে হইলে এবাদতে রিয়াকারী না করিতেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, বিশ্বাসের ক্রিয়া মূল আমলের মধ্যেও আছে এবং আমলের পূর্ণতা সাধনের মধ্যেও আছে। আর এই আয়াতে 'রিয়াকারী'কে শির্‌ক বলা হইয়াছে। কারণ, কাহাকেও দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত করাকেই 'রিয়া' বলে। বলাবাহুল্য, যাহাকে দেখান উদ্দেশ্য হয়, এবাদতের মধ্যে মোটামুটি সেও উদ্দেশ্য থাকে। কাজেই এবাদতকারী যেন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে আর একজনকেও উদ্দেশ্য করিয়াছে এবং এই শিরক তাহার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বটে, এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা 'রিয়া'কে শিরক বলিয়াছেন।

অতএব, বুঝা যায় যে, لَامَعْبُوْدَ اِلَّا اللهُ 'শুধু এক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ নাই'—ইহার নামই তওহীদ নহে; বরং আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কোন কিছুকে এবাদতে উদ্দেশ্য মনে না করাও তওহীদের পূর্ণতা সাধনকারী। ফলকথা, খোদা ভিন্ন অন্য কাহাকে উদ্দেশ্যও মনে করিবে না; তবেই এবাদতে অন্য কিছুর প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকিবে না। কাহারও প্রত্যাশা বা ভয়ও থাকিবে না। পূর্বোক্ত কবি তাঁহার কবিতায় এই মর্মটিই প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

موحد چه بر پائے ریزی زرش ـ چه فولاد هندی نهی بر سرش
امید وهراسش نه باشد ز کس ـ همین است بنیاد توحید وبس

এখান হইতেই বুঝা যায়, 'রিয়াকার' ব্যক্তি মানুষের নিকট প্রত্যাশী এবং তাহাদের হইতে ভীত থাকিবে। আর যেই ব্যক্তি 'রিয়া' হইতে মুক্ত থাকিবে, সে কাহারও প্রত্যাশী এবং কাহারও ভয়ে ভীত থাকিবে না। কেননা, খোদা ভিন্ন কাহারও প্রতি তাহার লক্ষ্যই থাকিবে না। মোটকথা, এই আয়াত ও হাদীসের যুক্ত মর্মে বুঝা যায়, কার্যের মধ্যে এবং কার্যের বিশুদ্ধতার মধ্যে বিশ্বাসের অসাধারণ প্রভাব রহিয়াছে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ

ইহার একটু পূর্বে আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَافِىٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَاطاِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتَاكُمْ ○

অর্থাৎ, "দুনিয়াতেও কোন বিপদ আসে না—এবং বিশেষ করিয়া তোমাদের জানের উপরও কোন বিপদ আসে না—পূর্ব হইতে উহা লওহে মাহফুযের দফ্‌তরে লিপিবদ্ধ হওয়া ব্যতীত।"

অদৃষ্টের স্বরূপ ঃ এই আয়াতটিতে আল্লাহ্ পাক তকদীরের মাসআলা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, তোমরা বিপদ-আপদ যাহাকিছুরই সম্মুখীন হও, তাহা পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখের দিকে আরও বলিতেছেন ঃ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ 'নিঃসন্দেহ, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে খুবই সহজ।' কেননা, তিনি অন্তর্যামী। কাজেই ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, পূর্ব হইতে তাহা লিপিবদ্ধ

করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। সামনের দিকে বলেনঃ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ অর্থাৎ اَخْبَرْنَاكُمْ بِذٰلِكَ لِكَيْلَا تَأْسَوْاعَلٰى مَافَاتَكُمْ “এইকথা আমি এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে বলিয়া রাখিলাম—যেন তোমাদের স্বাস্থ্য, সন্তান, ধন-সম্পদ বা মান-সম্মান যাহাকিছু বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমরা দুঃখিত না হও। আবার যাহাকিছু খোদা তা'আলা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহার জন্য গর্বিত না হও। কেননা, বিপদের বেলায় যখন এই বিষয়টি তোমার মনে উদিত হইবে যে, ইহা পূর্ব হইতেই অদৃষ্টে লিখিত রহিয়াছে এবং তাহাতে দুঃখের লাঘব হইবে। তদ্রূপ নেয়ামত সম্বন্ধেও যখন মনে করা হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হইতেই আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার অদৃষ্টে নেয়ামত লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে আমার কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। কাজেই তজ্জন্য অহঙ্কার বা গর্ব কিছুই হইবে না। কেননা, গর্বিত সেই ব্যক্তিই হইতে পারে, যাহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে বা নিজ ক্ষমতায় উহা লব্ধ হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে যখন অপরের ইচ্ছা ও নির্দেশে কোন বস্তু পাওয়া গেল, তাহাতে গর্বিত হওয়ার কি অধিকার থাকিতে পারে? সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তক্দীরের মাসআলা বর্ণনা করার কারণ এই বয়ান করিয়াছেন— যেন এই বিশ্বাসের বদৌলত বিপদে ধৈর্যধারণের তওফীক হয় এবং নেয়ামতে ও শান্তিতে অহঙ্কার এবং গর্বের উৎপত্তি না হয়। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কাজে ও কাজের সংশোধনে বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের যথেষ্ট কর্তৃত্ব রহিয়াছে।

শরীঅতে বিশ্বাসের স্থানঃ শরীঅতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বাসের দ্বারা কার্যক্ষেত্রে যেন কাজ লওয়া যায়। ফলত এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া মুহাদ্দেসগণ বলিয়াছেনঃ আমল ঈমানের অংশবিশেষ এবং আমলের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। খারেজী এবং মুতাযেলা সম্প্রদায় তো এতটুকুও বলিয়াছে যে, আমল ভিন্ন ঈমান কোন বস্তুই নহে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে আমল ঈমানের অংশ না হইলেও ঈমানের পূর্ণতা সাধনকারী অবশ্যই বলিতে হইবে। সুতরাং ঈমান যদিও বিশ্বাসকেই বলা হয়, তথাপি ইহার পূর্ণতা এবং অপূর্ণতাও নির্ভর করে আমলের উপর। বস্তুত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, উদ্দেশ্যযুক্ত বিষয়ে সর্বদা পূর্ণতাই কাম্য হইয়া থাকে, অপূর্ণ স্তরে কেহই ক্ষান্ত হয় না। যেমন, আমরা দেখিতেছি, পার্থিব কাজেও প্রত্যেকে পূর্ণতাই কামনা করিয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, শুধু আকীদা দুরুস্ত করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; বরং আমলেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। অন্যথায় আমল দুরুস্ত না করিলে আকীদা বা ঈমানও অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। দুনিয়াবী কার্যসমূহে ইহার তাৎপর্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

দেখুন, আপনি যদি কোন ব্যক্তিকে বলেন, “যায়েদ তোমার পিতা।” ইহার অর্থ শুধু এতটুকু নহে যে, যায়েদ তাহার বাপ বলিয়া অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া লইবে; বরং ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বাপ বলিয়া যায়েদের সহিত আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করা উচিত। এতদসত্ত্বেও যদি সেই ব্যক্তি নিজের পিতার সহিত আদব ও সম্মানজনক আচরণ না করে, তবে আপনি অবশ্যই তাহাকে তিরস্কার করিবেনঃ হতভাগা! আমি তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, যায়েদ তোমার পিতা, তবুও তাহার সম্মান রক্ষা করিলে না।

সুতরাং বুঝিয়া লউন, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহে কেবল বিশ্বাসই উদ্দেশ্য নহে; বরং তদনুযায়ী কাজ করাও উদ্দেশ্য। যদি কাজ বিশ্বাসের অনুরূপ না হয়, তবে বিশ্বাসের অস্তিত্ব নাই বলিয়াই মনে করা হইবে।

এই ভূমিকার পরে আমি বলিতেছি—মুসলমানগণ যদিও আখেরাতের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে এবং উহাকে দুনিয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তমও মনে করে ; কিন্তু তাহাদের আমল উক্ত বিশ্বাসের অনুরূপ নহে। সুতরাং উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে বলা ঠিক হইবে যে, আখেরাতের অস্তিত্বে তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস নাই। কেননা, যেই বিশ্বাসের অনুরূপ আমল করা হয় না, তাহা অপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ। এখন তো আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। আর আমাদের আমল এবং বিশ্বাসের সহিত যে ঐক্য নাই, তাহা আমাদের অবস্থা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কেননা, আমাদের কার্যক্ষেত্রে যদি কোন সময় দুনিয়া এবং আখেরাতের বিরোধিতা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে আমরা দুনিয়াকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া থাকি। যেমন—নামাযের সময় যদি আপনার দোকানে কোন খরিদ্দার আসিয়া পড়ে, তেমন অবস্থায় সাধারণত আপনি নামাযকেই পশ্চাদবর্তী করিয়া দুনিয়ার স্বার্থকে অগ্রবর্তী করিয়া থাকেন। ইহারই নাম দুনিয়াকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা।

তওবার ভরসায় পাপ কার্য করা নিষিদ্ধ ঃ এইরূপে যদি কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তবে এমন লোক অতি কমই দেখা যায়, যিনি খোদার ভয়ে বা আখেরাতের চিন্তায় দৃষ্টি নিম্নগামী করিয়া ফেলেন ; বরং অধিকাংশ লোকই নফ্‌সের তৃপ্তির জন্য তাহাকে খুব নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। ইহাও দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্যদানজনিত পাপের একটি শাখা। আবার কেহ এইরূপ মনে করিয়া থাকে—আখেরাতকে দুনিয়া হইতে অগ্রগণ্য করা আমার দ্বারা সম্ভব নহে, আমি অক্ষম ; ইহা তো বুযুর্গ লোকের কাজ। এই শ্রেণীর লোক পাপ কার্য করিয়া নিজেকে পাপীও মনে করে না। আবার অনেকে এমনও আছে যে, পাপ কার্যকে পাপই মনে করে বটে ; কিন্তু মনকে প্রবোধ দেয় যে, পরে তওবা করিয়া লইব। এই ভুলের মধ্যে বহু লোক পতিত রহিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ইহা সম্পূর্ণই নফ্‌সের ধোঁকা।

আমি অস্বীকার করি না যে, তওবা গুনাহের জন্য বিষ বিনাশক ঔষধ বিশেষ। কিন্তু বিষ বিনাশক ঔষধের ভরসায় বিষ পান করা কত বড় বোকামি! নিজের কাছে বিষ বিনাশক ঔষধ আছে, পরে উহা সেবনপূর্বক বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিব ; এই ভরসায় স্বেচ্ছায় দুই তোলা বিষ পান করিয়াছে, এমন কোন লোক আজ পর্যন্ত দেখি নাই। যদি এইরূপ কেহ করেও, তবে তাহাকে সকলেই পাগল অথবা নির্বোধ বলে এবং তিরস্কার করে যে, বিষের ক্রিয়া তো এখনই তুমি অনুভব করিবে ; বিনাশক ঔষধের ক্রিয়া যে পরে হইবে, তাহাও অনিশ্চিত। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, বিষের ক্রিয়া অত্যধিক হইয়া যাওয়ায় বিনাশক ঔষধে তাহা বিনষ্ট হইবে না। কিংবা বিষের তীব্র ক্রিয়া হঠাৎ এমন হইয়া পড়িতে পারে, যাহাতে তুমি বিনাশক ঔষধ সেবনের অবকাশই পাইবে না।

এইরূপে তওবার ভরসায় পাপ কার্য করাও আস্ত বোকামি। কারণ, গুনাহের অপক্রিয়া নগদ। আর তওবার উপকারিতা পরে লাভ করার ধারণা। কি নিশ্চয়তা আছে যে, ইহার পরে আয়ুও আছে কিনা? অনেক লোক ঠিক 'যেনা' কার্যে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। পাপ কার্য হইতে অবসরলাভের অবকাশও পায় নাই। দ্বিতীয়ত, তওবার ভরসায় একবার পাপ কার্য করিলে পাপের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়া যায়, পরে আর তওবার সুযোগ ঘটে না। কেননা, পরে আর কখনও এই পাপ কার্য করিব না—এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাও তওবার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। "হে খোদা! আমার তওবা কবূল করুন" এরূপ মৌখিক তওবা গ্রহণীয় নহে।

বিশেষত পাপ কার্য করার পর যখন পাপের প্রতি মনে মোহ ও আকর্ষণ লাগিয়া যায়, তখন তওবা করিতে উদ্যত হইলে নফ্স বলে, এই তওবায় কি লাভ? এই কাজ তো পুনরায় করিবেই। কাজেই তওবার আর সুযোগ হইল কোথায়? তখন নফ্স এইরূপ ওয়াদা করে—এই পাপ কার্যের সাধ পূর্ণ হইলে পরে সমস্ত গুনাহ হইতে একসঙ্গে তওবা করিয়া লইব। কিন্তু পরিশেষে এই ওয়াদাও পূর্ণ হয় না। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, পাপ কার্যের দরুন অন্তরে মরিচা পড়িয়া যায় এবং পুনঃ পাপ কার্য করিতে থাকিলে উক্ত মরিচা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সম্বন্ধে মাওলানা বলেনঃ

هرگنـــاه زنـگـے است بر مرأة دل ـ دل شود زیں زنگها خوار وخجـل
چوں زیـادت گشت دل را تیر گی ـ نفس دوں را پیش گردد خیـر گی

"প্রত্যেক গুনাহ হৃদয়-দর্পণের জন্য মরিচা এই মরিচা যতই বাড়িতে থাকে, হৃদয় ততই অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং লজ্জিত হইতে থাকে। এই অন্ধকার যতই বাড়িতে থাকে, নফ্সের অবাধ্যতাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে আর তওবার তওফীকই হয় না।"

অতএব, দীর্ঘকাল পাপ কার্যে লিপ্ত থাকার দরুন সেই মরিচার অন্ধকার এত প্রবল হয় যে, পরে আর তওবার তওফীক হয় না। কেহ তাহাকে তওবা করিতে বলিলেও সে উত্তর করে, "মিঞা! এত পাপের সম্মুখে বেচারা তওবা কি করিবে?" মোটকথা, শেষ পর্যন্ত সে খোদার রহমত হইতেও নিরাশ হইয়া পড়ে।

কোন কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে—মানুষ যখন তাহাদিগকে বলিয়াছে, "সমস্ত গুনাহ্ হইতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করিয়া লও", তখন তাহারা এই উত্তরই প্রদান করিয়াছে যে, এত অসংখ্য পাপকে একটি মাত্র তওবা কেমন করিয়া মোচন করিবে? শেষ পর্যন্ত হতভাগা এমতাবস্থায় তওবা না করিয়াই মরিয়াছে। এখন আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, ইহা নফ্সের কত বড় ধোঁকা—সে তওবার ভরসায় পাপ কার্যের প্রতি উৎসাহিত করিয়া থাকে।

বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করুন। নফ্সের এই ধোঁকায় পড়িবেন না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ "হে আয়েশা! পাপকে কখনও ক্ষুদ্র মনে করিও না।" বাস্তবিকপক্ষে তওবার ভরসায় যাহারা পাপ কার্যের প্রতি অগ্রসর হয়, তাহারা পাপ কার্যকে ছোট বলিয়াই মনে করে। ফলকথা, প্রত্যেক লোকের নিকট দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য প্রদানের এক একটি কারণ আছে। কেহই ইহা হইতে মুক্ত নহে। প্রত্যেকেই ইহার কোন না কোন একটি কারণ আবিষ্কার করিয়া লয়। কেহ নিজেকে 'মা'যুর' বা অক্ষম মনে করে। কেহ তওবার ভরসায় আছে। হাঁ, আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন সে-ই রক্ষা পায়।

দুনিয়ার প্রধান দুইটি শাখাঃ এমনি তো দুনিয়ার শাখার অন্ত নাই, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটি শাখা সর্বপ্রধান। ধন-দৌলত আর মান-সম্মান। ধন-মান লাভের জন্য অধিকাংশ মানুষই পাপের পরোয়া করে না, আখেরাত বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ধন-মান-লোভী মৌলবীরা বিরূপ ব্যাখ্যার সাহায্যে পাপজনক কার্যকে এবাদত এবং দুনিয়াবী কার্যকে আখেরাতের কাজ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, খোদা পাকের সম্মুখে এসমস্ত মতলবী ব্যাখ্যা কোন কাজে আসিবে না। যাহাহউক, মানুষ ধনের জন্য নানা উপায়ে ধর্মকে বিনষ্ট করিতেছে, কেহ ঘুষ গ্রহণ করে, কেহ অন্যায়-অত্যাচারপূর্বক অপর লোক হইতে অর্থ আদায় করে। এই সুযোগ অবশ্য সকলে পায় না।

ঘুষ গ্রহণ এবং অন্যায় উৎপীড়নের সুযোগ বা উপায় সকলের কোথায়? অবশ্য পরের ধন আত্মসাৎ করিবার একটি উপায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু লোক ইহাতে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহা এই যে, কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া উহা পরিশোধে গাফ্‌লতি করা। কাহারও কোন দ্রব্য কোন উপায়ে ঘরে আসিলে তাহা মালিকের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে জানে না। মৃত ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত ওয়ারিসী হক বণ্টনে অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে বা ব্যয় করিতে বেহিসাব ব্যয় করে। এইরূপ অবস্থা তাহাদেরই, যাহারা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গোপন করে না। কতক লোক তো এমনও আছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গোপনই করিয়া ফেলে। শাশুড়ীর ঘরে কোন বধূর মৃত্যু হইলে শাশুড়ী তাহার নিজস্ব ভাণ্ড-বাসন এবং অলঙ্কারপত্র হজম করিয়া ফেলে। তাহার মাতা-পিতাকে সামান্য কিছু দেখাইয়া বলে, তাহার নিকট ইহাই ছিল। পক্ষান্তরে মা-বাপের বাড়ীতে মৃত্যু হইলে যাহাকিছু তাহাদের হাতে পড়ে, মৃতার স্বামীকে সেই সম্বন্ধে কিছুই জানান হয় না; ইহা তো হইল একেবারে ময়লার উপর ময়লা। আমার কথা হইতেছে সে সমস্ত লোকের সম্বন্ধে, যাহারা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গোপন বা হজম করে না; কিন্তু ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে তাহারাও অসতর্কতার সহিত ব্যয় করে। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির গায়ের উপর বহু মূল্যবান শাল বা আলোয়ান দেওয়া হয়। পরে তাহা গরীব-মিস্‌কীনকে দান করা হয়; অথচ তাহাতে অনেক উত্তরাধিকারীর হক রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে নাবালকও আছে। সাবালকদের মধ্যেও সকলে এই কার্যে সম্মত নহে। আবার দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির ফাতেহা ইত্যাদি রসম পালনে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতেই সমস্ত ব্যয়নির্বাহ করা হয়। ইহাতে সমস্ত ওয়ারিসেরই হক রহিয়াছে, কিন্তু নাম করে বড় ওয়ারিস।

নাম ও গর্বের জন্য নিজের ধনও ব্যয় করা হারাম। পরের ধনে নাম অর্জন করা তো আরও অধিক জঘন্য ব্যাপার। অধিকন্তু তন্মধ্যে নাবালকও থাকে, আবার সাবালকেরাও সকলে অন্তরের সহিত তাহাতে সম্মত থাকে না। সম্মত থাকিলে পশ্চাতে এই সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয় কেন? অথচ দেখা যায়, পরে ভাগ-বণ্টনের বেলায় নানা প্রকারের অভিযোগ উত্থিত হয়; "এই ব্যয় তো তুমি নিজে করিয়াছ, আমাদের মত লইয়া তো এই খরচ কর নাই, সেই খরচের ভাগী আমরা কেন হইব?" লজ্জার খাতিরে কেহ না বলিলেও এই নীরবতায় সম্মতি প্রমাণিত হয় না! এইভাবে অযথা টাকা উড়াইতে হইলে সকলকে তাহাদের নিজ নিজ অংশ বাহির করিয়া দিয়া পরে নিজের অংশ হইতে তোমার যত ইচ্ছা খরচ কর। অথবা তাহাদের নিকট হইতে ধার লও এবং পরে সকলের ধার পরিশোধ কর। কিন্তু সেই ধার গ্রহণও যেন কাগুজে বিষয় না হয়, বরং প্রকৃত অর্থেই তাহা ধার গ্রহণ হইবে। অন্যথায় এজন্য আখেরাতে পাকড়াও করা হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ "ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাইতে আবদ্ধ থাকে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারে না।" যে সমস্ত ঋণ পরিশোধের নিয়তে গ্রহণ করা হয় নাই এবং অনাবশ্যক গ্রহণ করা হইয়াছে, উহাদের উদ্দেশ্যেই এই ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। তবে একান্ত প্রয়োজনে যে সমস্ত ধার লওয়া হইয়াছে, যাহার অভাবে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, বিশেষ কষ্ট হইত; সেই ধার সম্বন্ধে এই ভীতি প্রদর্শন করা হয় নাই। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, অনাবশ্যক 'রসম' পালন করিলে কি ক্ষতি!

আবার মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড়ও খুব বদান্যতার সহিত মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। মূল্যবান কাপড়ও দান-খয়রাত করা হয়, অথচ খয়রাত করা কোন কোন ওয়ারিসের ইচ্ছা নহে।

দুঃখের বিষয়, দান গ্রহণকারী খতাইয়া দেখে না যে, আমি যে কাপড় লইতেছি, ইহাতে সকল ওয়ারিস সম্মত আছে কিনা ? বরং এই ওযর পেশ করে যে, বাছ-বিচার করার দায়িত্ব আমার নহে। খোদার এই সমস্ত বান্দার এতটুকু জ্ঞান নাই যে, যেই ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নাই, সেইখানে অবশ্য বাছ-বিচার করার প্রয়োজন নাই; কিন্তু যেইখানে সন্দেহ—বরং প্রবল সন্দেহ আছে, সেইখানে খোঁজ-খবর লওয়া আবশ্যক। যেইক্ষেত্রে খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন নাই তাহা এই যে, এক ব্যক্তি আপনাকে দাওয়াত করিল, আপনি জানেন, তাহার আয়-আমদানী হালাল উপায়েই হইয়া থাকে। এস্থলে অবশ্য আপনার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই—এই মাংস কোথা হইতে আনিয়াছেন ? মূল্য কোন্ উপায়ে অর্জন করিয়াছেন ? কিন্তু যেইখানে দাওয়াতকারীর আয়-আমদানী সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহ আছে, সেইখানে খাঁজ-খবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আবার মুশ্কিল এই যে, আল্লাহ্র কোন বান্দা এইরূপ খোঁজ-খবর লইতে গেলে অন্যান্য আত্মীয়েরা তাহার এই চেষ্টা বানচাল করিয়া দেয়।

জনৈক জমিদার এক স্ত্রী এবং দুই নাবালক কন্যা রাখিয়া মরিয়া গেল। তাহার স্ত্রী মৃতের কাপড়-চোপড় আমার এইখানে পাঠাইলে আমি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম যে, ইহাতে নাবালকের হক রহিয়াছে। ঘটনাক্রমে তথায় এক মৌলবী ছাহেব ছিলেন। উক্ত কাপড় তাঁহার নিকট দানস্বরূপ পেশ করা হইল এবং আমার এইখানে যেই ওযরে গ্রহণ করা হয় নাই, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইল। মৌলবী ছাহেব বলিলেনঃ "পরিশেষে এই মেয়েদের বিবাহ-শাদীতেও তো তাহাদের ওয়ারিসী হকের চেয়ে অধিক তাহাদের মাতাকে ব্যয় করিতে হইবে; কাজেই তাহাদের মাতা এখন এই কাপড় দান করিতে পারেন।" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। এই তো হইল এক শ্রেণীর আলেমের অবস্থা। নিজেরাও খোঁজ-খবর লইবেন না এবং যাহারা খোঁজ-খবর লয় তাহাদের কার্যের প্রশংসাও করিবেন না; বরং তাহাদের সেই চেষ্টা বানচাল করিবার চেষ্টা করিবেন।

সর্বসাধারণের মধ্যে একটি সাধারণ নীতি প্রচলিত হইয়াছে যে, কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলেমদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে যেই পক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে, সেই পক্ষকেই হক্পন্থী মনে করা হয়। জানি না, এই নীতি কোথা হইতে কাহারা আবিষ্কার করিল ? অথচ ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, দলিল-প্রমাণের আধিক্যে কোন বিষয়ের অগ্রগণ্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না। মনে করুন, কোন একটি মোকদ্দমায় এক পক্ষে দুইজন সাক্ষী আর অপরপক্ষে একশতজন সাক্ষী হইলেও ইস্লামী বিচারক উভয়পক্ষকে সমানই মনে করিবেন। একদিকে সাক্ষীর সংখ্যাধিক্য অগ্রগণ্যতার কারণ হয় না। অবশ্য আলেমদের ঐকমত্য শরীঅতে অকাট্য দলিলরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, যাহা এজ্মা নামে অভিহিত। কিন্তু একদিকে অধিকসংখ্যক এবং অপর দিকে অল্পসংখ্যক আলেম হওয়ার নাম 'এজ্মা' নহে। ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ পরিষ্কার লিখিয়াছেনঃ একজন গণ্যমান্য আলেমও যদি বিরোধিতা করেন, তথাপি তাহাতে এজ্মা সাব্যস্ত হয় না।

ফলকথা, আলেমদের ইত্যাকার আচরণে সাধারণ লোকেরা দুঃসাহসী হইয়া পড়িয়াছে এবং সতর্কতা মোটেই অবলম্বন করে না; বরং নির্ভীক চিত্তে বলিয়া ফেলেঃ যদি সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত, তবে মৌলবী ছাহেবগণ কাপড় গ্রহণে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না কেন ? এইরূপে কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু চাহিয়া আনিলে যেই পর্যন্ত সেই ব্যক্তি চাহিয়া না নিবে, সেই পর্যন্ত তাহা ফেরত দিতে জানে না।

অনুমতি ব্যতীত পর-দ্রব্য ব্যবহার করা অবৈধঃ কেহ চিনা মাটির বা তাম্রের ডিশে করিয়া যদি আপনার বাড়ীতে খাদ্য-দ্রব্য পাঠায়, তবে আপনি সেই ডিশ বা ভাণ্ড-বাসন ফেরত পাঠাই-বার নাম করেনই না; বরং নিশ্চিন্ত মনে মাসের পর মাস ধরিয়া উক্ত পাত্রে খাদ্য আহার করিয়া থাকেন। অথচ ফকীহ্‌গণ বলিয়াছেনঃ যেই পাত্রে করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা হয়, তাহা হইতে অন্য পাত্রে লইয়া উক্ত খাদ্য খাওয়া উচিত। সেই পাত্রে রাখিয়া খাওয়া জায়েয নহে। হাঁ, যদি এইরূপ খাদ্য হয় যে, অন্য পাত্রে লইলে উহা বিস্বাদ হইয়া যায়, কিংবা আকার-আকৃতি বিকৃত হইয়া যায়, তবে সেই পাত্রে খাওয়া জায়েয আছে। যেমন, ফির্‌নী তশ্‌তরীর মধ্যে জমাইয়া পাঠান হইল। এমতাবস্থায় ফির্‌নী অন্য পাত্রে লওয়া হইলে উহার আকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। বস্তুত যেই পাত্রে ফির্‌নী জমান হয়, সেই পাত্রে খাওয়াতেই ফিরনীর স্বাদ; অন্য পাত্রে লইতে গেলে ফিরনী এলোমেলো হইয়া বিশ্রী আকার ধারণ করে, তখন আর উহা খাইতে প্রবৃত্তি হয় না।

কাজেই এইরূপ খাদ্য প্রেরকের পাত্রেই খাওয়া জায়েয আছে। অন্য প্রকার খাদ্য হইলে প্রেরকের ভাণ্ডে খাওয়া জায়েয নহে। ফকীহ্‌দের এই বিধানের যুক্তি এই যে, বিনানুমতিতে পরের দ্রব্য ব্যবহার করা জায়েয নহে। ভাণ্ডে করিয়া খাদ্য পাঠাইলে বুঝা যায় না যে, সেই ভাণ্ডে করিয়া খাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হইয়াছে। তবে পাত্র পরিবর্তনে যেই ক্ষেত্রে খাদ্যের স্বাদ বা আকার বিনষ্ট হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পাত্রে খাওয়ার অনুমতি আছে বলিয়া প্রকারান্তরে বুঝা যায়। আমি এই মাস্‌আলার কারণ ইহাই নির্ধারণ করিলাম; তবে খুব সম্ভব এইরূপ বিধান ফকীহ্‌গণ তৎকালীন প্রচলিত প্রথার উপর ভিত্তি করিয়াই দিয়াছেন। সেইকালে হয়তো খাদ্য প্রেরণকারীদের ভাণ্ডে খাওয়ার অনুমতি ছিল না। কিন্তু এইকালে আমাদের সমাজের রীতি অনুসারে খাদ্য প্রেরণকারীর তরফ হইতে তাহার ভাণ্ডে খাওয়ার অনুমতি থাকে। কিন্তু প্রেরিত খাদ্য খাওয়ার পর ভাণ্ড নিজ গৃহে রাখিয়া পরেও উহা মাসের পর মাস ধরিয়া ব্যবহার করার অনুমতি অবশ্যই থাকে না। তদুপরি আরও মুশকিল এই যে, কাহারও বাড়ীতে কোন স্থান হইতে খাদ্যসহ বাসন-পেয়ালা আসিলে তাহার যদি কোথাও খাদ্য প্রেরণের প্রয়োজন হয়; তবে নিজের বাসনে না পাঠাইয়া সেই পরের পাত্রেই পাঠাইয়া থাকে। অতঃপর উক্ত ভাণ্ড পরের বাড়ী যাইয়াও দীর্ঘ দিন পড়িয়া থাকে। যদি ঘটনাক্রমে কোন দিন এই ভাণ্ডে করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাণ্ডের প্রকৃত মালিকের বাড়ী কিছু পাঠান, তবে উহা লইয়া বিবাদের উদ্ভব হয়। প্রকৃত মালিক বলে, ইহা আমার ভাণ্ড, অপর ব্যক্তি বলে, বাঃ! ইহা তো কয়েক মাস ধরিয়া আমার বাড়ীতে পড়িয়া আছে। এখন কাহারও স্মরণ নাই যে, উক্ত বাসন কাহার বাড়ী হইতে আসিয়াছে এবং প্রকৃত মালিকের বাড়ী হইতে কাহার বাড়ী গিয়াছিল। এখন বিবাদ ভঞ্জনের জন্য ঈমান কোরআন ইত্যাদির কসম খাওয়া আরম্ভ হয়। ইহাও কি একটা সামাজিকতা বা জীবনযাত্রা?

আল্লাহ্‌র কসম; আমাদের মধ্যে বর্তমানে বড় নিকৃষ্ট ধরনের জীবনযাত্রা চলিতেছে। প্রত্যেকের উচিত নিজের গৃহিণীকে কঠোরভাবে বলিয়া দেওয়া, যখনই কাহারও বাড়ী হইতে খাদ্যদ্রব্য আসে, তৎক্ষণাৎ যেন তাহাদের বাসনপত্র ফেরত দেওয়া হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্! এই সম্বন্ধে আমার বিশেষ কড়াকড়ি রহিয়াছে; অপরের ভাণ্ড-বাসন ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আমার কোন শান্তি থাকে না। এই তো বলিলাম সাধারণ লোকদের অবস্থা।

আলেমদের অবস্থা দেখুন, কাহারও নিকট হইতে কোন কিতাব নিলে আর দেওয়ার নাম জানে না। কিতাব প্রদানকারী অধিক কর্মব্যস্ত লোক হইলে তাঁহার স্মরণও থাকে না যে, কিতাব কে নিয়াছে? অতএব, মাসেককাল পরে তিনি ধারণা করেন, কিতাব চুরি হইয়া গিয়াছে। এইদিকে গ্রহণকারী নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন, কিতাবের মালিক তো আর চাহিতেছেন না। এখন যেন ইহা তাঁহারই মালিকানাস্বত্ব হইয়া গেল। আবার কেহ কেহ এইরূপও আছেন, নিজের দ্রব্য কাহারও নিকট থাকিলে খুব কড়াকড়ির সহিত তাহা আদায় করিয়া লন; কিন্তু পরের দ্রব্য নিজের কাছে থাকিলে তাহা দেওয়ার বেলায় একদম বেপরোয়া। কেহ কেহ আবার দেওয়ার বেলায়ও বেপরোয়া এবং নিজের দ্রব্য লওয়ার বেলায়ও বেপরোয়া হইয়া থাকেন। এইরূপ লোককে মানুষ বুযুর্গ মনে করিয়া থাকে—একেবারে সংসারবিরাগী! পড়িয়া মরুক এইসমস্ত দরবেশ। ইহারা দরবেশ নহে, খোদার দরবারের অপরাধী। নিজের দ্রব্য লওয়ার বেলায় বেপরোয়া হওয়া অবশ্য দোষ নহে, কিন্তু পরের দ্রব্য ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হওয়া জঘন্য অপরাধ। আজকাল মানুষ উদাসীনতাকেই দরবেশী নাম দিয়াছে; অথচ আল্লাহ্ওয়ালাগণ লেন্‌দেনের ব্যাপারে বড়ই শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া থাকেন, পরের অধিকার কখনও নিজের দায়িত্বে রাখেন না।

সহানুভূতি প্রকাশ ও ধার দেওয়ার ফলঃ এই প্রকারে কোন কোন মানুষ ধার পরিশোধের বেলায় গড়িমসি করিয়া থাকেন। কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া এমনভাবে ভুলিয়া থাকেন যে, দেওয়ার নামই জানেন না। নিজের যাবতীয় কাজে অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য করিয়া থাকেন; কিন্তু ধার পরিশোধের চিন্তা নাই। এই কারণেই মুসলমান সমাজে সহানুভূতি লোপ পাইয়াছে। সমাজে বহু লোকের কাছেই আবশ্যকের অতিরিক্ত টাকা মওজুদ আছে, ইচ্ছাও করেন যে, কাহাকেও ধার দিয়া পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব হইতে রক্ষা পান, অপরের প্রয়োজনে কিছু সাহায্য হউক। কিন্তু দিবেন কাহাকে? লোকে ধার নিয়া দেওয়ার নামই লয় না; এই কারণেই আজকাল বিনা সুদে ধার পাওয়া যায় না। কেননা, বিনা সুদের দেনা পরিশোধের জন্য মানুষের কোন চিন্তাই হয় না। হাঁ, মহাজনের দেনার কথা খুব স্মরণ থাকে। কেননা, তাহারা পূর্বাহ্নেই তমসুকপত্র লিখাইয়া লইয়া আনন্দের সহিত সুদী করয দিয়া থাকে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ মিলাইয়া এক হাজারের স্থলে চারি হাজার টাকা আদায় করিয়া লয়; ব্যাস্, ইহাতে উভয়পক্ষই বেশ খুশী। আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ্। মানুষ যদি সুদী করযের ন্যায় বিনাসুদের করয পরিশোধের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করিত, তবে মুসলমানদের পরস্পরের নিকট হইতেই করয পাওয়া যাইত এবং মুসলমানদের ভূসম্পত্তি এইভাবে হিন্দুদের হস্তগত হইত না।

আমানতের ক্ষেত্রেও এইরূপ বিশৃঙ্খলা। কেহই কাহারও নিকট আমানত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না যে, আমানতী দ্রব্য হুবহু থাকিবে। অধিকাংশ লোকই আমানতী টাকা নিজের কাজে ব্যয় করিয়া বসে। এইরূপে চারি পাঁচ শত আমানতী টাকা ব্যয় করিয়া উহা পরিশোধ করা সম্বন্ধে কোনই চিন্তা করে না। আমানতকারী বেচারা তাহার নিকট টাকা চাহিলে বলে, ভাই! টাকা তো ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি। হাতে আসিলে দিয়া দিব। সে বলেঃ আপনি আমানতের টাকা ব্যয় করিলেন কেন? যেইখান হইতে সম্ভব হয়, আমার টাকা দিন। তখন আমানতদার বলেনঃ বন্ধু!